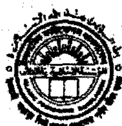
ফকীর নেতা মজনু শাহ্

মুহম্মদ আবূ তালিব

ফকীর নেতা মজনু শাহ্

মুহম্মদ আবূ তালিব



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফকীর নেতা মজনু শাহ্
মুহম্মদ আবু তালিব
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৮

ইফাবা প্রকাশনা : ৬৩০/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 984—06—0896—7

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৬৯

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৪
আষাঢ় ১৪১১
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

FAQUIR NETA MAJNU SHAH (Story of Majnu Shah, the Leader of Faquir Movement) : Written by Muhammad Abu Talib in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 30.00 ; US Dollar : 1.00

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা এখনও খুব স্বচ্ছ নয়। আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করতে যেয়ে কেউ ১৯৪০, কেউ ১৯০৬, কেউ ১৮৮৬, আবার কেউ কেউ সিপাহী বিপ্লব সুবাদে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত যান। কিন্তু অনেকেই জানেন না আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আরও প্রাচীন। সিপাহী বিপ্লবের অনেক পূর্বে পলাশী যুদ্ধের সামান্য পরে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে যে ফকীর আন্দোলন সংঘটিত হয়, সেটাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বপ্রথম পর্যায়। এ ফকীর আন্দোলনের অপব্যাখ্যা দিয়ে একে একটি দস্যু-ডাকাতদের লুণ্ঠন-অভিযান বলে ধামাচাপা দিতে সাম্রাজ্যবাদী লেখকগণ কম চেষ্টা করেন নি।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে রংপুরের হায়দর আলী চৌধুরী প্রমুখ গবেষকের কল্যাণে ফকীর আন্দোলনের চাপা-দেয়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়—সে ধারারই অন্যতম গবেষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব। ফকীর আন্দোলনের নেতা মজনু শাহ্ সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

লেখকের কথা

বিগত পাকিস্তান আমলে (১৯৬৯) অতি তাড়াহুড়ার মধ্যে মজনু শাহের কাহিনী রচিত হয়। তদানীন্তন পাকিস্তান পাবলিকেশানস, ঢাকা, বইখানি সাগ্রহে প্রকাশ করে (১৯৬৯)। বর্তমানে বইখানি দুষ্প্রাপ্য। তাই সঙ্গত কারণেই ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, বইখানি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করায় লেখক হিসেবে নিতান্তই গৌরব বোধ করছি।

মজনু শাহের কাহিনী ছিল আমাদের উপমহাদেশেরই বিস্মৃতপ্রায় ইতিকাহিনী। পরদেশী ইংরেজ শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে কিভাবে কত তাজা প্রাণের বিনিময়ে এ-দেশ মুক্ত হয়ে স্বাধীনতারূপ সোনার ফসল লাভ করেছিল, তার পূর্ণ কাহিনী আজও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। মজনু শাহের কাহিনী লিখতে গিয়ে কথাগুলি বিশেষভাবে মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা বড় সহজসাধ্য ছিল না।

বলাবাহুল্য, প্রায় এক যুগ ধরে চাকুরী ব্যপদেশে মজনু শাহের প্রধান বিচরণভূমি উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর-দিনাজপুর-বগুড়ার এলাকাগুলি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়। বহু কথা, কিংবদন্তী, এমনকি প্রাসঙ্গিক কিছু দলীলপত্রও এ সময়ে নজরে আসে। নিজে ঐতিহাসিক নই, তবে ইতিহাসানুরাগী পাঠক হিসেবে ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির কাহিনী হিসেবে এগুলি লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে হয়। তাই প্রথমে 'বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়' (১৯৬৮) রূপে, পরে 'ফকীর নেতা মজনু শাহ্' (১৯৬৯) নামে কাহিনীটি আত্মপ্রকাশ করে। বইগুলি সুধী মহলে সমাদৃত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বইগুলি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা হয়নি। আশা করা যায়, বর্তমান সংস্করণও পূর্বের মতো আদৃত হবে। পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ডক্টর সিরাজুল ইসলাম 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় আমার এতদসম্পর্কিত মতামতের বিস্তারিত আলোচনা করে আমার মতের অসারতা প্রমাণের কোশেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার কিছু বলার আগেই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জনাব মেসবাহুল হক সাহেব আমার অনুকূলে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখে তাঁর প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেন। ফলে আমার আর

কোন বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হয় না। বলাবাহুল্য, 'দৈনিক বাংলা'র এই বাদানুবাদ আমার স্বপক্ষে নতুন সুফল বয়ে আনে এবং ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন করে কৌতূহলের সূত্রপাত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তদানীন্তন গবেষক (পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) শ্রী রতনলাল চক্রবর্তী এ বিষয়ে নতুন করে গবেষণায় নিযুক্ত হন এবং কিছু নতুন তথ্যও উদ্‌ঘাটন করেন। গত বৎসর বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির পঞ্চম বার্ষিক ইতিহাস সম্মিলনের (১৯৭৯) বরিশাল অধিবেশনে বাকেরগঞ্জের ফকীর নেতা বালকী শাহ্‌ও তাঁর আন্দোলনের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেন, তাতে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। তাই আশা করা যায়, মজনু শাহের এই কাহিনী পুনঃপ্রকাশিত হলে ফকীর আন্দোলন তো বটেই, আমাদের ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হবে। এখন সুধী মহলের মেহের নজর আকৃষ্ট হলে ধন্য হব। ইতি—

রাজশাহী, ১লা বোশেখ, ১৩৮৭ সাল — মুহম্মদ আবূ তালিব
১৪ এপ্রিল ১৯৮০

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

একটি প্রশ্ন

উনিশ শতকের ভারতীয় পার্লামেন্টে বড়লাট লর্ড মেয়ো এই মর্মে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন ঃ ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে কি না যে, রাণীর রাজত্বের (ব্রিটিশ রাজত্বের) বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করতেই হবে !

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী উইলিয়াম হান্টার সাহেবকে "Indian Musalmans, are they bound in concience to rebel against the Queen ?" শীর্ষক গ্রন্থ লিখতে হয়েছিল।

কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, এই ঘটনার প্রায় এক শ' বছর আগে বাংলার এক মহারাণীর দরবারে ফকীর নেতা মজনু শাহ্ জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর (রাণীর) রাজত্বের নিরস্ত্র ও নিরীহ ফকীর-সম্প্রদায়কে অসহায়ভাবে হত্যা করে ইংরেজ কোম্পানী কি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় !

বলাবাহুল্য, সে প্রশ্নের জবাব আজও দেওয়া হয়নি। 'ফকীর নেতা মজনু শাহ্' গ্রন্থেও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়নি, তবে এতে ফকীর নেতার মূল প্রশ্নটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, এটুকু বলতে পারা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মজনু শাহের বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত কোন আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। সমকালীন সরকারী বিবৃতিতে বিকৃতি এত বেশি যে, তা থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ধারও নিতান্ত দুঃসাধ্য বলে মনে করা যেতে পারে। তথাপি বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে এ সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলাম, ইতিপূর্বেই 'বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়' নামক গ্রন্থের একটি অধ্যায় হিসেবে তা প্রকাশ করেছিলাম। সুখের বিষয়, বিষয়টি আমাদের সুধীসমাজের, বিশেষ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স-এর তরফ থেকে এ বিষয়ে আমাকে গ্রন্থ রচনার ভার দিয়ে শুধু যে আমাকেই গৌরবান্বিত করা হয়েছে, তাই নয়, এ জন্য তাঁরা নিজেরাও গৌরবান্বিত হয়েছেন। বিশেষ করে মজনু শাহের মতো একজন জাতীয় বীরের বিস্মৃতপ্রায় কীর্তিকথা প্রকাশ করার ভার নিয়ে তাঁরা জাতির কাছেও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার জন্য যাঁরা আমায় নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের

বন্ধুবর্গসহ রাজশাহী শহরের বন্ধুবর্গকে। পরিশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুর রয্যাক, রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামের কিউরেটর ডঃ মুখলেছুর রহমান ও গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুল মাজেদ সাহেবানের সহৃদয়তার কথাও স্মরণ করছি। এই সঙ্গে আমার পাণ্ডুলিপি রচনার সময় যে বন্ধু প্রায় সবসময়ই কাছে ছিলেন, সেই আফজাল চৌধুরী সাহেবের কথাও স্মরণীয় মনে করছি। গ্রন্থের বাহ্যিক পারিপাট্যের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রকাশক, মুদ্রক ও প্রচ্ছদ-শিল্পীদের ; তবে আভ্যন্তরিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যে গ্রন্থকার, এ কথা বলাই বাহুল্য। এখন গ্রন্থখানি সুধী-সমাজের কিছুমাত্র মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। আমিন ! ইতি—

মুহম্মদ আবূ তালিব

॥ এক ॥

পূর্বাভাস

"হাঁকে বীর শির দেগা
নেহি দেগা আমামা।"

—নজরুল ইস্‌লাম

বাংলার মুসলিম রাজত্বের সর্বশেষ 'তেজীয়ান পুরুষ' নবাব মীর মুহম্মদ কাসিম আলী খান যেদিন ভাগ্য-বিড়ম্বিত ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে ফকীরের বেশে পথে পথে স্বাধীনতার নামে, স্বদেশের নামে, মানবতার নামে, ব্যর্থ ফরিয়াদ করে ফিরছিলেন, সেদিন কি কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পেরেছিলো যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একজন ফকীরনেতা বাংলার নবাবের পরিত্যক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন ?

বলাবাহুল্য, আমি আঠারো শতকের ফকীর নেতা মজনু শাহের কথা বলছি।

বিতাড়িত নবাব মীর কাসিম কি এ-কথা জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁরই মতো মজনুন (পাগল) হয়ে মজনু শাহের অনুসারী যুবাদল ফকীর ও সন্ন্যাসীর ছদ্মনামের আড়ালে তাজাপ্রাণের নযরানা দিয়ে রাজপথ রক্ত-রাঙা করে তুলবে ?

তিনি শুধু জানতেন, তাঁর আযাদী প্রয়াসের প্রথম অধ্যায়ে সেই উধুয়ানালা (১৭৬১) ও বক্সারের (১৭৬৪) মহাসংগ্রামক্ষেত্রে একদল অর্ধনগ্ন ফকীর-সন্ন্যাসী মাত্র তাঁর স্বাধীন পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে নবাব মীর কাসিম সেদিন পরাজিত ও বিতাড়িত হন। এই পরাজয়ের মূলে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতখানি, আর তাঁর বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ও আত্মীয়-পরিজনের কতখানি, সে বিচার করে আজ লাভ নেই। কিন্তু সেদিন দেশবাসীর সামান্য অবহেলায় বাংলার মসনদ যে প্রায় দুই শত বছরের জন্য এক বিদেশী রাজশক্তির হস্তগত হয়েছিল, যার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ তাজাপ্রাণের বিনিময়ে সে মসনদ উদ্ধার করতে হয়েছিল, আজ বড় বেদনাকাতর চিত্তে সে কথা স্মরণ করতে হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, নবাব মীর কাসিমের সে পরাজয় শুধু বাংলার নয়, সারা পাক-ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা। এই পরাজয়ে শুধু বাংলায় মুসলিম শাসনের পতন হয়নি, এ পরাজয়ে সারা পাক-ভারতের ইতিহাসে মুসলমানের ভবিষ্যৎ-উত্থানের পথও চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে। ফকীর নেতা মজনু শাহের আন্দোলন সেই হারানো আযাদীর উদ্ধারের আর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হলেও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ আন্দোলন একটি উজ্জ্বল অধ্যায়—এ-কথা সত্যের অনুরোধে বলতে হবে।

॥ দুই ॥

সূচনা ঃ পলাশীর পর

১৭৬১ ঈসায়ীর ২৯শে ডিসেম্বর।

বর্ধমান শহরের 'বাত্তাসী কা বাগ' থেকে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইট জানান যে, বর্ধমানের রাজা মিসরী খান, দুদার সিং, ফকীরগণ ও বীর ভূমাগত এক সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ অবস্থানের উপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। বর্ধমান ও সঙ্গতগোলার মধ্যবর্তী নদীর তীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অতঃপর ১৭৬৪ সালেও পদচ্যুত নবাব মীর কাসিমের পক্ষে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের এক বিরাট বাহিনী বক্সারে সম্মিলিত হয়। ১৭৬৪ সালের ১২ই মে তারিখে হুগলীর ফৌজদার বাদল খান ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর সাহেবকে যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

"তিনি জানতে পেরেছেন যে, বর্তমান মাসের ৩রা তারিখে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ, পাটনার গভর্নর রাজা বেনী বাহাদুর, মীর কাসিম, সমরু, হিম্মত গীর এবং অন্যান্য শত্রু-সেনাপতিগণ কামান, রকেট ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রসহ তাঁদের কাছ থেকে প্রায় দুই অথবা তিন ক্রোশ দূরে পাঁচপাহাড়স্থিত মেজর কারনাকের ছাউনি আক্রমণ করেন। দুই সৈন্যদল সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তুমুল গোলা ও ছোট অস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবং শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।"[১] বিখ্যাত ঐতিহাসিক গুলাম হুসাইনের 'সীয়ারুল মূতা আখেরীন' গ্রন্থেও এ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে আছে—"রাজা বেনী বাহাদুর ও বেনারসের রাজা বলবন্তসিংহ মন্ত্রীর পাশেই অবস্থান গ্রহণ করেন। রোহিলা-প্রধান এনায়েত খানের নেতৃত্বে তিন হাজার ভাড়াটিয়া রোহিলা সৈন্যও ছিল। তার পাশেই ছিল সন্ন্যাসী বা ফকীরনেতা হিম্মত গীরের অধীনস্থ পাঁচ হাজার ফকীর সেনা। তারা তাদের গুরুর মতোই অর্ধনগ্ন ছিল। গোসাঈ তাঁর সেই অর্ধনগ্ন সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে ইংরেজ বাহিনী এমন তীব্রভাবে সে আক্রমণ প্রতিহত করে যে, তাহাদের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধে অনেকেই হতাহত হয়।"[২]

---

১. J. M. Ghose, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal (Calcutta, 1830) P. 15-16

২. Ghulam Hussain : Seir Mutaquerin, vol. 11. pp. 531-33, Guoted in 'Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal' by J. M. Ghose. P. 1., 16.

এর পরেই নবাব মীর কাসিমের ভাগ্যবিপর্যয়। ভাগ্যান্বেষী নবাব সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে ফকীরের বেশে সুদূর রাজপুতনার ধূসর মরুবক্ষে, বুন্দেলখণ্ডের পথে-প্রান্তরে, মধ্য-ভারতের গিরিগহ্বরে, ঝাড়-জঙ্গলে দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে, মানবতার নামে, ধর্মের নামে, কত মানুষের কাছে কত আবেদন-বিনেদন করলেন, কত অশ্রুবিসর্জন দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে জন্মভূমি থেকে দূরে দিল্লীর শাহ-জাহানাবাদের অন্তর্গত এক অখ্যাত পল্লীতে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন (রবিউস সানী ৩০, ১১৯১ হিজরী, মুতাবিক ৭ই জুন, ১৭৭৭ ঈ.)।

এককালের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহাসম্মানিত নবাব মীর মুহম্মদ কাসিম আলী খানের দেশ উদ্ধারের সকল প্রচেষ্টা, প্রজার ও দেশের কল্যাণ কামনা ও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় এবং অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর শেষ অঙ্গাবরণ দিয়ে তাঁর অন্তিম শয়ন-শয্যা রচিত হয়।[৩]

তারপর ?

---

৩. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। মীর কাসিম (কলিকাতা, ৪র্থ সং), পৃ. ২৩৬-৪৯ এবং Major Poliers Acccont to Col. Ironside at Belgram. Dated 22nd May. 1776 Bengal Past and Present. Vol. XXXIV. Part II. Sl. No. 68., P. 95.

॥ তিন ॥

জলে ভাসে শিলা

২০শে ডিসেম্বর, ১৭৭২ ঈসায়ী।

লর্ড হেস্টিংস সমকালীন বাংলার বড়লাট সাহেব, জানতে পারেন, একদল ফকীর ও সন্ন্যাসী দস্যুদলের আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে গিয়ে দু'জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারসহ সমগ্র সেনাবাহিনীই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। এই দু'জন সেনানায়ক হলেন যথাক্রমে ক্যাপ্টেন টমাস ও ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস। শুধু তাই নয়, লাট সাহেব আরও জানতে পারেন, যাদের সাহায্যার্থে এই সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তারা তাঁদের এই আত্মত্যাগের মর্মকথাই বুঝতে পারেনি; ফলে তাদের জীবন-রক্ষার চেষ্টা না করে উল্টো দস্যুদলেরই সাহায্য করেছে। এমনকি রাজকীয় সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র, ধন-সম্পদও তারা লুট করেছে।

একটা নয়, দুটা নয় চার চার ব্যাটালিয়ান সৈন্য এই দুর্বৃত্তদলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। 'এ যে জলে ভাসে শিলা।' ভাবেন, ব্রিটিশ ভারতের কর্ণধার।

কেমন করে এমন হল?

আর এই ফকীর-সন্ন্যাসীরাই বা কারা?

॥ চার ॥

সে যে এক বেদুঈন দল

সে যে এক অপূর্ব বেদুঈন দল—ভেবেছেন উপমহাদেশের অন্যতম প্রথম ভাগ্যবিধাতা লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর নিজেরই ভাষায় ঃ[৪]

"এদের (ফকীর-সন্ন্যাসীদের) ইতিহাস বড় অদ্ভুত। এরা বাস করে, অথবা বলা যেতে পারে, কাবুল থেকে চীন দেশ পর্যন্ত তিব্বত দেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে যে বিশাল ভূভাগ অবস্থিত, সেটি এদের অধিকারভুক্ত। এরা কাপড় পরা জানে না; এদের কোন শহর, বাড়িঘর, এমন কি পরিবার-পরিজনও নেই। এরা অনবরত ভ্রমণরত থাকে। এরা পথে কোন স্বাস্থ্যবান শিশু দেখলে তাকে চুরি করে নিজেদের দলের সংখ্যা বাড়ায়। তাই এরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে সবল এবং কর্মঠ লোক। এদের অনেকেই ব্যবসায়ী। এরা তীর্থপথিক, তাই জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলেই এদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এ-জন্য এদের প্রতি তারা এত সম্মোহিত যে এদের চলাফেরা বা এদের বিরুদ্ধে কোন সংবাদাদিও তাদের কাছে পাওয়ার উপায় নেই। এমনকি কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রদেশের অভ্যন্তরভাগ থেকে এরা এমন আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় যে মনে হয়—এরা বুঝি আকাশ থেকে

---

৪. "The history of the people is curius. They inhabit of rather possess the country lying south of the hills of Thibet, From Cabul to Chaina. They to mostly naked they have nither town, houses, nor families; but robe continuosly from place to place. recruiting their members with the healthiest children they can steal in the country through which they pass. Thus they are the stoutest and most active men in India. Many are merchants. They all pilgrims and halled by all castes of Gentoos in great veneration. This infatuation prevents our obtaining any intelligence of their motions, and aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes, in so much that they often appear in the heart of the Province as if they dropped from the heaven. They are hardybold and enthusiastic to degree surpassing credit. Such are the Sanyasis, the Gypsis of Hindustan."

Hestings letter to Joslas Depre, dated 9th March, 1973, is found in Creigh's Memoirs.

পড়েছে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, সাহসী, প্রশংসাতীত উদ্যমী ও আস্থাভাজন। এই সেই সন্ন্যাসী, পাক-ভারতের বেদুঈন দল।"

মিঃ হেস্টিংস যাদের 'বেদুঈন জাতি' বলে উল্লেখ করলেন, উইলিয়াম হান্টার তাদের রীতিমত 'ডাকাত' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ধার্মিকতার খোলস পরে এরা ডাকাতি করে এবং ডাকাত ছাড়া এদের অন্য কোন পরিচয় দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তার বিস্তৃত পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা করা যাচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

হান্টার সাহেবের বিবৃতি

"A set of lawless banditti," wrote the council in 1773, known under the name of Sanyasis, or Faquirs have long enfested these countries; and under pretence of religious pilgrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal begging, stealing and plundering wherever they go, and as its best suit their convenience to practise."[৫]—W.W. Hunter

এর সহজ মানে হল এই যে, সন্ন্যাসী ও ফকীর নামধারী একদল দুর্বৃত্ত দল বেঁধে সারা দেশব্যাপী চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি করে ফিরছে; বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা ধর্মপ্রচারক অর্থাৎ তীর্থপথিক, কিন্তু আসলে তারা দস্যু-তস্কর ব্যতীত কেউ নয়।

তবে হান্টার সাহেব তার গ্রন্থে সন্ন্যাসী-ফকীরের লুটতরাজের কথা বলতে গিয়ে কয়েকটি বেশ মজার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—পূর্বোক্ত ইংরেজ সেনাপতিদ্বয়কে হত্যাকালে ফকীর-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রজাদের মধ্য থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রজা (যারা হান্টার সাহেবের মতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত) যোগাদন করেছিল। এবং এই প্রজাকুল রাজকীয় সেনাবাহিনীর আনুকূল্য করতে ভুলে গিয়েছিল; কেননা তারা এমনই দুঃস্থ ছিল যে তাদের ঘরে খাবার পর্যন্ত ছিল না; চাষাবাদের উপযোগী বীজধান এমন কি লাঙ্গল-জোয়াল পর্যন্তও তাদের কিনবার ক্ষমতা ছিল না।

কথাটি অবশ্য মিথ্যে নয়, এই ঘটনার কিছুদিন আগেই বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ সাল=১৭৬৯-৭০) অতিবাহিত হয়েছে। তখনও তার জের চলছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকুল আত্মরক্ষার জন্য রাজকীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা না করে দস্যু-দলের সহযোগিতা করবার কারণ কি?

মনে হয়, হান্টার সাহেবরা স্বজাতিবৎসলতার খাতিরে নেটিভ (পাক-ভারতবাসীর) প্রজাকুলের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখতে ভুল করেছিলেন। নইলে তিনি দেখতে পেতেন—যারা ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করেছিল, তারা লুণ্ঠনকারী ফকীর বা সন্ন্যাসী নয়—কোচবিহারের বিদ্রোহী 'রায়কত' বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেবের অধীনস্থ বিদ্রোহী

৫. W. W. Hunter. The Annals of Rural Bengal (Calcutta. 1868), P. 70-72.

সেনা। ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করার পরও তারা দর্পদেবের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। রায় যামিনী মোহন ঘোষও স্বীকার করেছেন যেথ—"After the Skirmish in which Capt. Thomas was killed at the end of 1772, a band of Sannyasis marched north-wards Coochbehar to re-enforce the Snnayasis Under Durrup Deo. The old quarrel between Durrup Deo (Darpa Deb), Raja of Baikuntpur, and the Nazir Deo for supremacy in the State of Coochbehar still continued."[৬]

অতএব ক্যাপ্টেন টমাস এডওয়ার্ডস হত্যা কোন নতুন বিষয় নয়। আরও উল্লেখ্য যে, এই সময়ে দর্পদেবের সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল এবং তিনি সন্তোষগঞ্জ দুর্গে অবস্থান করছিলেন। কোচবিহারের ইতিহাস-লেখক আমানতউল্লাহ্ সাহেব (ইনি এককালে কোচবিহারের মন্ত্রীও ছিলেন) এই সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন এ-ভাবে, "কাপ্তান টমাস দর্পদেবের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পূর্ব হইতেই সসৈন্যে সন্তোষগঞ্জে (?) অবস্থান করিতেছিলেন। কাপ্তান জোন্স ৩০শে জানুয়ারী চাঙ্গড়াবান্ধা হইতে গভর্নরকে লিখিয়াছিলেন যে, তিন পরদিবস রহিমগঞ্জের দুর্গ অধিকার করিবেন এবং যদ্যপি ভুটিয়াদিগের আক্রমণে কোচবিহারের অবস্থা বিপজ্জনক না হয়, তাহা হইলে তিনি নদী পার হইয়া দর্পদেবের প্রধান কেন্দ্র জলপাইগুড়ি আক্রমণ করিবেন, তথায় বহু ফকীর সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন।" অতঃপর ক্যাপ্টেন জোন্স তিস্তা পার হয়ে বৈকুণ্ঠপুরে হাজির হন। তাঁর সঙ্গে দু'টি কামান ও একটি হাউইজার ছিল। রায়কত দর্পদেব তখন বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে অবস্থান করছিলেন।

তাই বলাবাহুল্য, ক্যাপ্টেন টমাসের হত্যাকারী ফকীর-সন্ন্যাসীদল কোন কল্পিত ও বহিরাগত দস্যু-তস্করদল নয়—এ দেশেরই বিদ্রোহী প্রজাকুল, যারা যুগপৎভাবে অত্যাচারী কোচবিহার রাজ ও তাঁর সহায়তাকারী বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছিল। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে সমকালীন কোচবিহার তথা বাংলার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

---

৬ 'রায়কত' কোচবিহারের রাজ-ছত্রবাহকের পদবী। দর্পদেবের পূর্বপুরুষগণ এই পদাধিকার বলে বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল জমিদারীটি জায়গীর হিসেবে লাভ করেন। সন্ন্যাসীকোটাতে তাঁর রাজধানী ছিল। দর্পদেব ইতিপূর্বেই কোচবিহার-রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, কিন্তু পদবীটি বজায় ছিল। ইতিপূর্বে সুলতান শাহ্ মুহম্মদ সুজার সুবাদারী আমলে সওলাতজঙ্গের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠপুর বিজিত হলে দর্পদের ও তাঁর এক ভাই বন্দী হন। সুদীর্ঘ ১৭ বছর বন্দীজীবন-যাপনের পর মীর কাসিম আলী খানের ফৌজদারী আমলে তাঁরা মুক্তি পান। কিন্তু তিনি আর রাজকার্যে যোগদান করেননি। রঙ্গপুরের ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক মি. পার্লিং তাঁকে একজন বিদ্রোহী রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।

॥ ছয় ॥

কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে

"কোম্পানীর সহিত সন্ধি স্থাপনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা (ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নাজীরকে বলেন, "বাবা নাজীর রাজ্য কোন কোম্পানীতে দিলা ? দত্ত গজ সিক্কার রাজত্ব অন্যকে রাজকর দিলে ছত্রধারী রাজা কি প্রকারে বলা যায় ?" নাজীর উত্তর দিয়াছিলেন ঃ "মহারাজ আপনকাক রাজ্যসহিত শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করার কারণ কোম্পানীতে লালবন্দী স্বীকৃত হইয়াছি।" রাজা বলিলেন, "আমার কর্মে যা ছিল হইয়াছে, বিশ্বসিংহের বংশের সন্তান একজন নাই অন্যজনে রাজা হইত; স্বয়ং সিদ্ধি রাজা ছিলাম অখন অন্যের অধীনতা কি প্রকারে স্বীকার করিব।"

কোচবিহারের ইতিহাস

(কোচবিহার, ১৯৩৬, পৃ. ২১১-১২)

বক্সারের প্রান্তরে যেদিন বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন চিরতরে সমাহিত হয়, সেদিন দুর্বলচিত্ত মুঘল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপনের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সন্ধিও হয়—নামেমাত্র ২৬ লক্ষ টাকা ভাতার বিনিময়ে বিশাল ভারতবর্ষকে ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়—'দেওয়ানী'। মানে, দেশের সর্বময় কর্তা নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাট থাকবেন এবং তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মূলত কোম্পানীর হস্তেই প্রদত্ত হয়। এই ঘটনা ঘটে বক্সারের মাত্র এক বৎসর পরে ১৭৬৫ ঈসায়ীতে। বলাবাহুল্য, বাংলার প্রত্যন্ত এলাকার ক্ষুদ্র কোচবিহার রাজ্যটি তখনও স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে আসছে। এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটে। কোচবিহারের শিশুরাজা জনৈক রতিদেব কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হন (১৭৬৫)। শিশু রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের প্রত্যক্ষ বংশধর না থাকায় রাজা নির্বাচনে রাজবংশ ও নাযীর রুদ্রনারায়ণের বাংশের মধ্যে কোন্দল জেগে ওঠে। নাযীর রুদ্রনারায়ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে অভিষিক্ত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। রঙ্গপুরের ইংরেজ কালেক্টর তাঁর আনুকূল্য করতে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে ভুটান রাজের পক্ষে দেবরাজ দেবযধুর (দেবযোদ্ধা) রাজপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শেষ পর্যন্ত দেবযধুরের কৌশলে রাজপক্ষের জয় হয়—মৃত রাজার তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে

আরোহণ করেন। প্রথম পুত্র রামনারায়ণের দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হলেও তিনি ইতিপূর্বেই রাজার অধীনে দেওয়ান পদ গ্রহণ করায় কুলমর্যাদা অনুসারে রাজা হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হন। দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণও বিশেষ কারণে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তৃতীয় পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হওয়ার গৌরব লাভ করেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে রাজা ধৈর্যেন্দ্রের ধের্যচ্যুতি ঘটে, ফলে আপন ভ্রাতৃরক্তে রাজঅসি কলঙ্কিত হয়। দেওয়ান রামনারায়ণ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক নিহত হন (১৭৬৯ সালের এক অশুভ মুহূর্তে)। নিহত রামনারায়ণ আবার ছিলেন ভুটানের দেবরাজ দেবযধুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাই স্বাভাবিকভাবে দেবরাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং অবিলম্বে সৈন্য পাঠিয়ে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে সানুচর বন্দী করে ভুটানে নিয়ে যান। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে পূর্ব নাযীর রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনারাযণ নাযীরপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এবং স্মরণ থাকতে পারে যে, খগেন্দ্রনারায়ণ একবার রাজপদে প্রার্থী ছিলেন। দেবরাজ কর্তৃক বন্দীকৃতভাবে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে নীত হওয়ার পরেও রাজাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টা না করায় নাযীর খগেন্দ্রনারায়ণের যথেষ্ট বদনাম রচিত হয়। ওদিকে দেবরাজ রাজার মধ্যম ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসন দান করেন। এবং ভুটানের প্রতিনিধি হিসেবে পেনগুতোমা কোচবিহারে অবস্থান করতে থাকেন।

এই রাজার সময়েই প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপস্থিত হয়। কোচবিহার রাজ্যও এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। এই সময়ে রঙ্গপুরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মিঃ গ্রস। যতদূর জানা যায়, কোচবিহার রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অবহিত কুরশা নামক স্থানে জার্মানী ও ফরাসী বণিকেরা শস্য সংগ্রহের জন্য আড়ত স্থাপন করেছিলেন। কুরশা অঞ্চলের শস্যাদি রঙ্গপুরে আমদানি হত, অন্যবারের মতো এবারও যেন তার অন্যথা না হয় সে বিষয়ে মিঃ গ্রস কোচবিহার রাজকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, কুলপ্রথানুসারে রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন নি, ভুটিয়াদের দ্বারা কোচবিহারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন; উপরন্তু রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ তখনও জীবিত ছিলেন। এসব কারণে রাজেন্দ্রনায়ণের প্রতি দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধাও ছিল না। সে যাহোক এ অবস্থা বেশি দিন হয়ত স্থায়ী হত না, কিন্তু দৈবনির্বন্ধে দু'বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করার পর রাজেন্দ্রনারায়ণ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। ফলে রাজ্যময় পুনরায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কোচ-রাজনীতি এবার আর এক জটিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। কে রাজা হবেন ? মৃত রাজার বৈকুণ্ঠনারায়ণ নামে এক ভাই ছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র কুমার বীজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে ভুটিয়া প্রতিনিধির সমর্থন

ছিল। এই সময়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বহুদিন পর কোচবিহারের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ভূতপূর্ব রায়কত বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব। কোচবিহার সিংহাসনের প্রতি তাঁদের পূর্বদাবি প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ তিনি ছাড়তে রাযী হন না। শুধু তাই নয়, ভুটিয়াদের সহায়তায় কোচবিহার রাজ্যের অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। পক্ষান্তরে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের অনুগ্রহভাজন সর্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মহিষীর অনুরোধে নাযীর খগেন্দ্রনারায়ণের সাহায্য ভিক্ষা করেন এই মর্মে যে, রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের শিশু পুত্রকে (বর্তমানে বন্দীকৃত) যেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নাযীর খগেন্দ্রনারায়ণের কাছে এ দাবি মনঃপূত হয়, কেননা তিনি ধীজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের শক্তি বৃদ্ধি করতে রাযী ছিলেন না। আর ভুটিয়াদের প্রতিও তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না।

অতঃপর ছত্র নাযীর কুমার ধরেন্দ্রনারাযণকে যথারীতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এ ভাবে ব্যাপারটির আপাত সমাধান হয় বটে, তবে চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

খগেন্দ্রনারায়ণ ধরেন্দ্রনারায়ণকে গোস্বামী ও লাহিড়ীর অনুরোধে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন বটে, তবে তাঁদের কোন প্রভুত্ব হয়—এরূপ কোন কার্য করতে তিনি স্বভাবতঃই রাযী ছিলেন না। কিন্তু রাণী কামতেশ্বরীর উপর লাহিড়ী ও গোস্বামীর কিছু প্রভাব থাকার কথা অচিরেই প্রকাশিত হয়ে পড়ায় নাযীর মনে মনে বিরক্ত হন। কিন্তু আপাতত কোন কথা প্রকাশ করেন না। তিনি ভুটানের প্রতিনিধিকেও অপমানিত করে তাড়িয়ে দেন। পেন্‌শুতোমা ভুটানে ফিরে গিয়ে রাজ্যের অবস্থা জ্ঞাত করায় দেবরাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নাযীরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার সংকল্প করে প্রথম পর্যায়ে তিন কাহন (৩৮৪০) সৈন্য বক্সাদুয়ারের পথে কোচবিহার আক্রমণের জন্য পাঠান।

নাযীরও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। নাযীরের ভ্রাতা ভগবন্ত নারায়ণের যোগ্য নেতৃত্বে কোচসৈন্য 'চেকাখাতা' নামক স্থানে ভুটিয়াবাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে।

ভুটিয়াসৈন্যের এই পরাজয় সংবাদে দেবরাজ হতোৎসাহ হন নি। তিনি অবিলম্বেই তাঁর এক ভাগিনেয়ের (জিম্পের) অধীনে প্রায় দশ হাজার সুশিক্ষিত ভুটিয়াসৈন্য কোচবিহারে প্রেরণ করেন। সময় বুঝে রায়কত দর্পদেব সসৈন্যে ভুটিয়াদের সঙ্গে সম্মিলিত হন। এবার নাযীর পড়েন মুশ্‌কিলে। রাজধানীতে সর্বসাকুল্যে মাত্র তিন হাজার সৈন্য মৌজুদ ছিল। তারমধ্যে তিন চার'শ আবার ছিল রাজপ্রাসাদ কোষাগার ইত্যাদি রক্ষার কাজে নিযুক্ত। এখন উপায় ? গোস্বামী ও লাহিড়ী রঙ্গপুর থেকে প্রায় চার হাজার সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম হন। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সুবিশাল ভুটিয়া সৈন্য ও

রায়কতের প্রজাবাহিনীর তুলনায় তা নিত্যন্তই তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়। যুদ্ধে কোচরাজের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। রাজধানী ভুটিয়াবাহিনীর করায়ত্ত হয়। প্রায় চার হাজার কোচসৈন্য নিহত হয়। বলা বাহুল্য, গোস্বামীর অধীনে একদল সন্ন্যাসী সেনাও এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। পরে ইংরেজের সাহায্যে যুদ্ধ জয় হওয়ার পর মিঃ পার্লিং অপ্রয়োজনীয় মনে করে সন্ন্যাসীদেরকে বিদায় দিয়েছিলেন।

পরাজিত নাযীর, গোস্বামী ও লাহিড়ী রাজ-পরিবারসহ প্রথমে বলরামপুরে, পরে রঙ্গপুরস্থিত পাঙ্গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওদিকে রায়কতের পরামর্শক্রমে দেবযধুর এই জয়কে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আরও দু'হাজার ভুটিয়া-সৈন্যের এক বাহিনী নাযীরের বিরুদ্ধে বিজনীদুয়ারের পথে প্রেরণ করেন। বিজনীদুয়ারে বাহিনীর আনুকূল্য করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পাঠানো হয়। কিন্তু গোস্বামী ও লাহিড়ীর পরামর্শে পরাজিত নাযীর রঙ্গপুরের কালেক্টর পূর্ববন্ধু মিঃ পার্লিং-এর মধ্যস্থতায় ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করায় কোচবিহারের রাজনীতি অন্যপথে পরিচালিত হয়। এবং পরিণামে কোচবিহারে ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হয়। এ ভাবে পঞ্চদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজবংশের স্বাধীনতা লোপ পায় (১১৭৯ সালের ৬ই মার্চ, মুতাবিক ১৬ই জানুয়ারি, ১৭৭৩ ঈ.)।

তাই বলতে দোষ নেই, হান্টার সাহেব কল্পিত সন্ন্যাসী-ফকীর কর্তৃক টমাস এডওয়ার্ডসের হত্যাকাহিনীর মূলে এটুকু সত্যই হয়ত নিহিত আছে যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকূলের সহায়তায় নয়, বরং রঙ্গপুর-কোচবিহারে বিদ্রোহী জনসাধারণই টমাস এডওয়ার্ডসকে সত্যা করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী-ফকীর নামধারী যে দস্যুদলের চিত্র তাঁরা সকলে মিলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার মূলে কল্পনার কুয়াশাই বেশি ইন্ধন যুগিয়েছে।

আরও একটি কথা।

উপরে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের যে ইতিহাস বর্ণিত হল তার শেষ এখানেই হয়নি। কোম্পানীর সাহায্যে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মুক্তি ও মৃত্যুর পরে নাযীর খগেন্দ্রনারায়ণের প্রভুত্বলাভের আরও কলঙ্ককর দিকের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস আলোচনা করবার সময় ও স্থানের নিতান্তই অভাব। তবে সংক্ষেপে এটুকু বলে রাখা যায় যে, রাজার মৃত্যুর পরে নাযীর শিশু রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও রাণীমাতাকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন এবং পরে রাণীর আবেদনে ইংরেজ সৈন্য পুনরায় কোচবিহারে নাযীরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন ও শিশু রাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে উদ্ধার করেন (১১৪৪ সাল ১৭৩৭)। কোচবিহারের ইতিহাসে এই ঘটনা 'রাজা ধরা' কাহিনী নামে খ্যাত। বলাবাহুল্য, একদল সন্ন্যাসী সেনা এবারও

নাযীর খগেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। এই সেনাবাহিনীর নায়ক ছিলেন গণেশ গীর নামে এক সন্ন্যাসী-দলপতি। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ধৃত গণেশ গীরের যথাবিহিত বিচার করে শাস্তি প্রদানের মনস্থ করেন, কিন্তু বিচারকালেই সন্ন্যাসীনেতার মৃত্যু হওয়ায় তা ব্যর্থ হয়। বলাবাহুল্য দেশীয় রাজন্যবর্গের পারিবারিক ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সময়ে এই ধরনের সন্ন্যাসী ও ফকীর নামধারী অনিয়মিত সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ ও সাহায্যদানের ইতিহাস আমাদের দেশে নতুন নয়, তাই বলে তাদেরকে নিত্যন্তই দস্যু-তস্কর লুটেরাদের দলে ফেলে নাজেহাল করতে হবে বা তাঁদের মহত্ত্বের উপর কলঙ্ক আরোপ করতে হবে, এমন কথা কিছুতেই বরদাশ্ত করা যায় না।

॥ সাত ॥

মজনুর কবিতা

"শুন সভে এক ভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা।।
কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকীর।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।।
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বান ঝাউল নিশান।।
উট গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি।।
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজী।
মজনু তাজির পরে যেন মরদ গাজী।।
দল বল দেখিয়া সবের আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম।"

—পঞ্চানন দাসস্য

উদ্ধৃত অংশে 'মজনু ফকীর' নামে এক দস্যুনেতার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন সমকালীন লোককবি পঞ্চানন দাস।

কিন্তু এ কেমন দস্যু ?

কবি 'কালান্তক যম বেটা' বলে হয়ত বলতে চেয়েছেন—তার অত্যাচারে দেশবাসীর ধন-প্রাণ নিরাপদ নয়। কিন্তু পরেই বলছেন 'যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির' এ কেমন কথা ? দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে—শুধু দুর্বল নয়, সবলের বলও তার কাছে তুচ্ছ। তাহলে সবল-নির্বল, ধনী-নির্ধন সকলেই তার ভয়ে অস্থির। এখানে প্রশ্ন এই যে, সবলের উপরেও যার বল, সে নিঃসন্দেহে মহাবলশালী। আর মহাবলশালী যে দুর্বলের উপর বল খাটিয়ে তার লাভ কি ? আর নির্ধনের পরে নির্যাতনইবা সে করতে যাবে কেন ?

এর পরে আবার কবি যা বলছেন সে আরও চমকপ্রদ—তার চাল-চলন নাকি আদৌ দস্যু-তস্করের মতো নয়—'সাহেব সুবার মতো' এবং সে চলন শুধু সুন্দর নয়—'সুঠাম'ও।

সে যখন পথ চলে তার আগে আগে চলে 'ঝাণ্ডা-নিশান', আর সাথে চলে 'উট, গাধা, ঘোড়া, হাতী'। সুন্দর সুসজ্জিত ঘোড়ায় চলে কত কত ঘোড় সওয়ার, 'তীর-বরকন্দাজী' মাঝখানে বসে দস্যু নেতা মজনু; তাঁকে দেখায় যেন 'মরদ গাজী'র মতো।

কবি অবশ্য তাঁর ভয়াবহ অত্যাচারের ছবি এঁকে জনমনে বিভীষিকার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কবির কলমে যে ছবি এঁকেছে সে যে এক মহামহিম নবাব-বাদশার ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু কে এই 'মজনু ফকীর'?

মজনু ফকীরের যথার্থ পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া যাচ্ছে, আগে বাংলা সাহিত্য ও লোক-ঐতিহ্যে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বয়ান করার চেষ্টা করা যাক। বিশেষ করে উনিশ শতকের উপন্যাস-রাজ বঙ্কিমচন্দ্র ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে দু-খানি মরমী উসন্যাস রচনা করেছেন, তার পরিচয় দেওয়া নিতান্তই জরুরী। পরবর্তী অধ্যায়টি সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হল।

॥ আট ॥

বাংলা সাহিত্যে মজনু ফকীরের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রখ্যাত আনন্দমঠ উপন্যাসে লিখেছেন—"সত্যানন্দ বলিলেন, হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেননা রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। "হে মহাত্মন! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।"

মহাপুরুষ। "ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।"

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

(আনন্দমঠ। বঙ্কিম চন্দ্র, পৃ. ১১৬)

ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথের মতে, "ভবানী পাঠক একজন ভোজপুরী ব্রাহ্মণ। তাহার সহযোগী এবং ততোধিক বড় ডাকাতের সর্দার মজনুন শাহ মেওয়াতী অর্থাৎ বর্তমান আলোয়ার রাজ্যের লোক; বাঙ্গালায় তাঁহার জন্ম হয় নাই, এবং মৃত্যুর পরেও

তাঁহার দেহ বাঙ্গালা হইতে সেই সুদূর মেওয়াতে কবর দিবার জন্য পাঠানো হয়, বাঙ্গালায় হেয় মাটিতে নহে।"[৭]

স্যার যদুনাথ অবশ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা বলেছেন; তাঁর বক্তব্য ভবানী পাঠকের বাঙালিত্ব নিয়ে, তাই প্রসঙ্গক্রমে ভবানীর 'ফ্রেন্ড-ফিলোজফার এন্ড গাইড' মজনুন শাহের নাম করতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক অবশ্য মজনুন কেন, মজনুনের স্বধর্মীদের প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি; কেননা তাহলে যে প্রকৃত ফকীর আন্দোলনের ইতিহাস এসে পড়ে এবং তিনি সে কথা বলতে নারায্।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য ঐতিহাসিকদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি, বরং এই আন্দোলনের ইতিহাসের জন্য ইংরেজ মনীষী হান্টার সাহেবের 'রঙ্গপুরের বিবরণী'-মূলক গ্রন্থখানি পড়বার জন্য অনুরোধ করে ঐতিহাসিকদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—

"আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।

দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হান্টার সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account' মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশি নয়, এবং 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফটেনান্ট রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

তা না হয় না করলাম, কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী', আনন্দমঠে ইতিহাসের যে উপাদান আছে, তাই বলে তাকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, "সত্যকার সন্ন্যাসী ফকীরেরা অর্থাৎ পশ্চিমের গিরিপুরীর দল, একেবারে লুটেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায়

৭ স্যার যদুনাথ সরকার ('দেবী চৌধুরাণী' শত বার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা স্মরণ লিখিত, পৃ. ৫)।

জমিদারীও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াসা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আনন্দমঠে বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোনমতেই ঐতিহাসিক, এই বিশেষণ পাইতে পারে না।"[৮]

স্যার সরকার পশ্চিমের গিরিপুরীদের যে কথা বললেন, হান্টার সাহেবরা সে বাঙালি জমিদার সম্পর্কেই তাই বলেছেন। একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—"The Principal Zaminders in most parts of the districts have always a banditti ready to let loose on such of their unfortunate neighbours as have any property worth seizing, and even the lives of the unhappy sufferers are seldom spared. The Zaminders commit these out rages with the most perfect security, as there is no reward offered for their detections and from the dependence of the dakits upon them, they cannot be detected without bribery."[৯]

এই মন্তব্য লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের। তাই দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীতে শুধু ইতিহাসের নামগুলিই নয়, সত্যি ইতিহাসের যথাযথ চিত্রও ফাঁকে ফাঁকে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে। স্যার সরকারও তা অস্বীকার করতে পারেন নি—"যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ দেবী চৌধুরাণীর সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙালিরাও ডাকাতি করিত।"

'খাঁটি বাঙালিরা'ও কিরূপ 'ডাকাতি করিত' বর্তমান গ্রন্থের বহুস্থানে সে চিত্র দিবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে লেফটেন্যান্ট ব্রেনান কথিত ভবানী-মজনুন-চৌধুরাণী প্রভৃতি ডাকাতদের সামান্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

ব্রেনান সাহেবের মতে, পাঠক উত্তর প্রদেশের বাজপুর বা ভোজপুরের বাসিন্দা; স্যার যদুনাথের মতে এই ভোজপুর বিহার প্রদেশের আরা জিলার অন্তর্গত। ভবানী একজন দস্যুনেতা, তাঁর দস্যুদল প্রধানত তার স্বদেশবাসী। মজনু শাহ্ নামে একজন বিখ্যাত দস্যুনেতার সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ আছে। মজনু গঙ্গার দক্ষিণ দিক থেকে পার হয়ে প্রায় প্রতি বৎসরই এ দেশে লুটতরাজ করতে আসে। ব্রেনান সাহেবের বিবৃতি থেকে আরও পাওয়া যায়, পাঠকের সঙ্গে একজন মহিলা ডাকাতের সঙ্গেও বিশেষ যোগাযোগ আছে। এই মহিলা দেবী চৌধুরাণী নামে পরিচিত। ব্রেনান সাহেবের

---

৮. সরকার। পূর্বোক্ত (আনন্দমঠের ভূমিকা, পৃ. ১৩)।

৯. W. W. Hunter Statistical Account of Bengal. Vol. Vil (Calcutts. 1875). P. 159.

ধারণা, ইনি কোন মহিলা জমিদার হবেন এবং ইনি ব্যাক্তিগতভাবে এক বিরাট বরকন্দাজ বাহিনী পোষেণ এবং তাদের দ্বারা স্বাধীনভাবে চুরি-ডাকাতি করেন। এতদ্ব্যতীত ভবানী পাঠকের লুটতরাজের অংশ বিশেষও লাভ করে থাকেন। ক্যাপ্টেন ব্রেনানের ধারণা, দেবী চৌধুরাণী বোটে থেকে ডাকাতি করেন; এর কারণ সম্পর্কে তিনি অনুমান করেন যে, ধরা পড়বার ভয়ে তিনি এই উপায় অবলম্বন করে থাকেন।

১৭৮৭ সালের জুন মাসে ভবানী পাঠক ও তার দল ক্যাপ্টেন ব্রেনানের হাতে সদলবলে নিহত হন। পাঠকের প্রধান সহকারী একজন পাঠানও এই সময়ে নিহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘটনার কয়েকদিন আগে রঙ্গপুর জিলার গোবিন্দগঞ্জের কাছে পাঠক সদলবলে অবস্থান করছিলেন। ইতিপূর্বেই জনৈক তামাকের ব্যবসায়ীর নৌকা লুট করার অভিযোগে ঢাকা থেকে কাস্টমস বিভাগের সুপারিন্‌টেনডেন্টের নির্দেশে পাঠককে বন্দী করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পাঠক সুপার সাহেবের পরওয়ানার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। অতঃপর সিপাহীগণ নাটোরের আদালতের জজ মিঃ ফেন্ডেলের সাহেবের কাছে এই ঘটনা বলে নালিশ জানায়। পাঠক এই ঘটনা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি বগুড়া জিলার এলাকাধীন সারিয়াকান্দিতে প্রস্থান করেন। সারিয়াকান্দি এই সময়ে সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। এই সারিয়াকান্দি থেকে ফেরার পথেই পাঠকের নৌকা ক্যাপ্টেন ব্রেনান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পাঠকের সহকারী পাঠান যুবক জীবনপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন না। পাঠক নিজেও এই যুদ্ধে নিহত হন। উল্লেখ্য যে, পাঠক পূজিত কালীমুর্তিটি অদ্যাবধি তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে আসছে বলে কথিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত কাউনিয়ার (রঙ্গপুরের) নিকটবর্তী 'চৌধুরাণী' রেল স্টেশনও দেবী চৌধুরাণী' স্মৃতিসূচক।

মিঃ ব্রেনান পাঠক হত্যার কাহিনী লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সহযোগী মজনু ও দেবী চৌধুরাণীর নাম করেছিলেন। মজনু শাহকে তিনি শুধুমাত্র বিখ্যাত ডাকাত বলে উল্লেখ করেন। মজনুকেও তিনি উত্তর-প্রদেশীয় বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, মজনু বছরে একবার করে সদলবলে এসে লুটপাট করে আবার ফিরে যেত। দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে ব্রেনান কৌতূহল প্রকাশ করেন মাত্র। কারণ, দেবী চৌধুরাণীর কোন সন্ধান তিনি পাননি মনে হয়। তবে তার নৌকায় থেকে ডাকাতি করা ও বিরাট বরকন্দাজ বাহিনী পোষা, ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যতদূর সংবাদ পেয়েছিলেন, রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবকে জানিয়েছিলেন। কালেক্টর সাহেব তার জবাবে ১২ই জুলাই ১৭৮৭ সালে যে চিঠি লেখেন তাতে ভবানীর ধৃত অনুচরগণকে ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য পাঠাবার কথা আছে; কিন্তু দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব আপাতত কোন নির্দেশ দিতে অপরাগ হন। তিনি বলেন—"I cannot at present give

you any orders with respect to the female dackoit mentioned in your letter. If on examination of Bengal (i) papers which you have sent it shall appear that there are sufficiant grounds for apprehending her and if one shall be found within the limits of my Jurisdiction I shall hereafter send you such orders as may be necessary."

উল্লেখ্য যে, দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে এর বেশি কোন সংবাদ সরকারী বিবরণীতে পাওয়া যায় না। ভবানী পাঠক সম্পর্কেও নয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এই সংবাদটুকু মাত্র সম্বল করে এবং সম্পূর্ণ ফকীর-বিদ্রোহের পটভূমিতে তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দমঠ' ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস রচনা করে 'ভবানী পাঠক' (আনন্দমঠে 'ভবানন্দ') ও 'দেবী চৌধুরাণী'কে অমর করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মজনু শাহের প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি ফকীর বিদ্রোহের মর্মকথাকেও বিকৃতভাবে এবং সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর আনন্দমঠের সন্তানেরা আজ গোটা ভারতবর্ষকে ভারত (হিন্দুস্তান), পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কায়েম করেছে এবং বহির্বিষয়ক জ্ঞান দান করে ইংরেজ-চিকিৎসকও অন্তর্হিত হয়েছেন। সে কথা যাক। এখন আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করা যাক ঃ

আনন্দমঠ

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কথা না হয় নাইবা বললাম, কিন্তু আমাদের আযাদীর এই প্রথম প্রয়াসকে তিনি যে কিভাবে বিকৃত করে এক সম্পূর্ণ কল্পনার প্রাসাদ রচনা করেছেন, ইতিহাস-পাঠকদের তা অন্তত জেনে রাখা দরকার।

আগেই বলা হয়েছে, ক্যাপ্টেন টমাস ও এডওয়ার্ডস-এর হত্যা ফকীর-সন্ন্যাসীদের কীর্তি হলেও এ হল রাজনৈতিক হত্যা; অন্তত দস্যুদলের লুটতরাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন দেখা যাক।

"ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণের জন্য প্রেরণ করিলেন।

ক্যাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমিদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানীর সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী-বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানীর সৈনিকরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।"[১০]

বলাবাহুল্য, বঙ্কিমের সন্তান-সেনা সব বৈষ্ণব, এবং মুসলিম-সন্তানদের প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেন নি। অতএব, মজনু শাহ বা তাঁর মুসলমান সন্তানদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। বরং বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথা বার বার করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এ যুদ্ধ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়—মুসলমান রাজার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

১০. বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, শতবার্ষিকী সং (২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৫৪-১৯৪৭) পৃ. ৭০-৭১।

কাপ্তেন টমাস ইংরেজ, তাই তার দলের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ নেই। তবে যেহেতু ইংরেজ সৈন্যগণ মুসলমান রাজার সহায়তা করতে এসেছেন, তাই তাঁদের বিরুদ্ধে সন্তান-সেনারা যুদ্ধ করছে। ইতিহাসের কথা পরে বলা যাচ্ছে, এখানে সাহিত্য-সম্রাটের একটি সহজ রসিকতার উল্লেখ করে আপাতত এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

"কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন,

'টুমি কে?'

সন্ন্যাসী বলিল, 'আমি সন্ন্যাসী।'

কাপ্তেন বলিলেন, 'টুমি rebel।'

সন্ন্যাসী ঃ সে কি?

কাপ্তেন ঃ হামি, তোমায় গুলি করিয়া মারিব।

সন্ন্যাসী ঃ মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কিনা, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণ চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমি স্ত্রীলোক কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোসলমানে মারামারি করিতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"[১১]

মনে রাখা প্রয়োজন, যে সময় এই ঘটনা ঘটেছে, তখন ১৭৭২ সাল। মুসলিম রাজত্বের অবসানে কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হয়েছে। বাংলায় ইংরেজরাই প্রকৃত মালিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ-সময়ে স্বাধীনতার জন্য মুসলিম নিধনের কোন প্রয়োজন নেই; অথচ সন্তান সেনারা সেই কার্যেই নিয়োজিত।

আরও কৌতূহলের ব্যাপার, সাহিত্য-সম্রাটের সন্তান-সেনারা জয়লাভ করেছে, সারা দেশ আজ তাদের করায়ত্ত। এখন হিন্দুরাজত্ব কায়েমের আর কোন অসুবিধা নেই। সত্যানন্দ ঠাকুর তারই আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় এক দৈবীপুরুষের আগমনে সত্যানন্দ ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হল।

"সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?"

১১. বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বোক্ত পৃ. ৭১-৭২ (শ-সং)।

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, সত্য।

কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।"

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু। যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে ? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে ?"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে তাহা লোপ পাইয়াছে। ইত্যাদি।"[১২] ঔপন্যাসিকের মতে এই সানাতন ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই নাকি ইংরেজ রাজত্বের প্রয়োজন, সাহিত্য-সম্রাট যেমন 'বুঝিয়াছেন', তেমনি 'বুঝাইলেন'। শুধু যে উপন্যাস পাঠককেই তিনি এ কথা বলেছেন তাই নয়, ইতিহাসের পাঠককেও তিনি তাই শিখিয়েছেন বা শিখাবার চেষ্টা করেছেন। যথা—

"মুসলমানদের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত।"[১৩] এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।
১৩. বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্ব, পৃ. ১০৬।

দেবী চৌধুরাণী

'দেবী চৌধুরাণী' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য নয়, তবে ঔপন্যাসিক তাকে কিভাবে তাঁর উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন, ইতিহাসের মানদণ্ডে তার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

আনন্দমঠের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন টমাস্-এডওয়ার্ডস্ আসলে কোচবিহারের রাষ্ট্রবিপ্লবের শিকার এবং এই রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম হোতা বিদ্রোহী রায়কত দর্পদেবের জায়গীর বা জমীদারী হল বৈকুণ্ঠপুরে। ক্যাপ্টেন টমাস ও ক্যাপ্টেন জোন্স রহীমগঞ্জ দুর্গ আক্রমণকালে রায়কত বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র এজলাস বসত। পাঠকদের অবগতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সে জঙ্গলের কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি—"দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে (তিস্তা নদীর) চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেকদূর গিয়া একটি জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যে ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস অব হেস্টিংশ যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পাঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্বে আর কখনও তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্বল বা গণ্ডমূর্খ তাহারাই 'ভাল মানুষ' হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা লজ্জা ছিল না।"

কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র দেবীকে দিয়ে 'ডাকাইতি' সমর্থন করাতে পারেননি। একটু নমুনা দিই—

'ব্রাহ্মণ বলিল, 'মা কাল রাত্রে-তুমি কি করিয়াছ ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি ?'

দেবী বলিল, 'আপনার কি বিশ্বাস হয় ?'

রাহ্মণ বলিল, 'কি জানি ?'

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্ণ পরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, 'কি জানি কি' ঠাকুর ? আপনি কি আমায় জানেন না ? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই–তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন, 'কি জানি ?'

"ভবানী রাগ কর কেন ? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেননা, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি ? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না।"

আর একটু নমুনা দেই—

"বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দেবীর 'এজলাস' বসেছে। 'সে এজলাসে কোন মামলা-মোকদ্দমা হইত না। রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।'

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমি খণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস।.....

দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবী প্রতিমার মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহু সংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোশাক পরিয়া বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাঁড়া হইয়াছে। সকলের উপরে জাঁক বরকন্দাজ সারি। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল।.....

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার 'দেবীরাণী কি জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিল।....

দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় নিলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকা পোরা ঘড়া সব সাজান ছিল। এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দান করিলেন।......

কিছুদিনের মধ্যে রঙ্গপুরে গুডল্যাড সাহেবের কাছে সংবাদ পৌছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা

নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা ? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচপত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকমে লুটিতেছে।"[১৪] উপন্যাস বর্ণিত গুডল্যাড সাহেবের সময়েই বিখ্যাত প্রজা বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাছে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর একস্থানে সমকালীন বাংলার দুর্দশার যে চিত্র দিয়েছেন, সে চিত্র বহু প্রজা বিদ্রোহের সমতালীয় নয় শুধু একান্তই প্রজা বিদ্রোহের। এখানে ভবানী ঠাকুরই যেন বিদ্রোহীদের নেতা নূর উদ্দিনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

"—ভবানী ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভুম্যাধিকারীর দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারীর কর্মচারীরা বাকীদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণ বধ করে। সিংহাসন হইলে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া ডলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারীতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিধৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দূরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্বলকে রক্ষা করি।"[১৫]

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র, দেবী চৌধুরাণী' শতবার্ষিকী, সং ৪র্থ, [কলকাতা, ১৩৫৩ (-১৯৪৬)] পৃ. ৮৯।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

॥ নয় ॥

দেবীসিংহ সংবাদ

"কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময় মুল্লুকেতে হইল বার ঢিং ।।
যেমন যে দেবতার মরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভষণ বাহন।।
রাজার পাপেতে হইল মুল্লুকে আকাল।
শিয়রে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।
* * *
মানীর সম্মান নাই মানী জমীদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার।।
সোয়ারীতে চড়িয়া যায় পাইকে মারে গোতা।
দেবীসিংহের কাজে আজ সব হইল ভোতা।।
পারেনা ঘাটায় চলতে ঝিউরি বউরি।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তারে জোর করি।।
পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিং রাজা।
দেবীসিংহের উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।

* * *
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদমাইস পাকা।।
শিব চন্দ্রের হাদে এই সব দুক্ষে বাজে।
জয়দুর্গায় আজ্ঞায় শিব চন্দ্র পাজে।।"

—রতিরাম রায়

এই দেবীসিংহই 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস কথিত অত্যাচারী ইজারাদার এবং তার 'বারো ঢিং' বা সহচরদের মধ্যে যার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি হলেন রঙ্গপুর জিলার ডিমলার বিখ্যাত জমিদার বাবু হররাম সেন। ইনি দেবীসিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দেবীসিংহ হররামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহ

করেছিলেন, তাঁদের সর্বাধিনায়ক বলে যাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি হলেন—নবাব নূরউদ্দীন। রতিরামের কাব্যে তাঁদের মধ্যে আরও দু'জন জননেতার নাম ও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী ও শিবচন্দ্র রায়। খুব সম্ভবত এই দেবী চৌধুরাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী হবেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর পরিচয় পেয়েছিলেন শুধুমাত্র লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের একটি পত্রে, যেখানে তাঁকে একটি ক্ষুদ্র জমিদার (Probably a petty one) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রতিরামের দেবী চৌধুরাণী সম্ভবত নয়, সত্যি সত্যিই একটি বিশাল জমিদারীর মালিকা ছিলেন মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর খোঁজ রাখতেন না, রাখলে তাঁকে দিয়ে রাজা নীলাম্বর রায়ের পোড়োবাড়ীর মাল-মাত্তা আর উঠানো লাগত না।[১৬] ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর "পূর্বকালে উত্তর বাঙ্গালার নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য শাসন করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল।....গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। ইত্যাদি।"

বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র নীলাম্বরের ইতিহাস বলেন নি। এই নীলাম্বর গৌড়ের সুলতান রুকন উদ্দীন বরবক শাহ (মৃত্যু ১৪৭৪ ঈ.)-এর সমসাময়িক একজন রাজা। যে সেনাপতি নীলাম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন তাঁর নাম ইসমাঈল গাযী। ইনি নীলাম্বরের রাজ্য জয় করেন। ইনি একজন কামিল দরবীশও ছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল গাযী (র) বিশেষ বিখ্যাত। ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'গাজী বিজয়' কাব্যে এই ইসমাঈল গাযীরই চিত্র অঙ্কিত করেছেন সুলতানের আদেশেই গাযী সাহেব নিহত হয় (শাহাদাত ১৪৭৪ ঈ.)। রঙ্গপুর জিলার কাঁটাদুয়ারে তাঁর মাযার অবস্থিত। যথার্থ পরিচয় রতিরামের উপরিউক্ত গানেই আছে গানে দেবীর সহযোগী শিবচন্দ্রেরও যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়েছে মনে হয়।

রাজারায়ের পুত্র হয শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সবলোকে গায়।।

আর দেবী চৌধুরাণী—

মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ জগতে বাখানি।।

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

অন্যত্র আবার তাকে 'পীরগাছার কর্ত্রী' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। খুব সম্ভব, এই দুইটি জমিদারীই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। কবির ভাষায়—

'পীরগাছার কর্ত্রী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনেতে বৈসে একে একে সবি।।"

সম্প্রতি রঙ্গপুর জিলা থেকে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী প্রদত্ত জমিনের দানপত্রে জয়দুর্গার স্বাক্ষর আবিষ্কৃত হয়েছে।

কবি রতিরাম দেবীসিংহের অত্যাচারজনিত দেশবাসীর দুর্দাশার যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা যেমন নিখুঁত তেমনি প্রাণবন্ত। যথা—

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরনে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস।।
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাহি কারো মায়া।।

তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভিক্ষ বর্ণনা (আনন্দমঠে) ঃ

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়।—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর-বাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তরপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে ছেলে স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই সকলেই বেচিতে চায়।"

উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ছিয়াত্তরের বিখ্যাত মন্বন্তরের কথা (১১৭৬ সাল=১৭৬৯-৭০), আর রতিরাম বলেছেন, (১১৯০ সালের=১৭৮৩) প্রজা-বিদ্রোহের কথা, হান্টার সাহেবও তাঁর গ্রন্থে সমকালীন বাংলার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার কথা বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হান্টার সাহেব প্রমুখ ইংরেজ মনীষী দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যে প্রজাবিদ্রোহের সংযোগ রয়েছে, তা বেমালুম অস্বীকার করে গেছেন। তাঁরা বিদ্রোহী প্রজাদেরকে চোর-ডাকাতের সামিল করতে চেয়েছেন। এই হিসেবে মজনু-ভবানী-দেবী চৌধুরাণীকে তাঁরা একাকার করে ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তবু বিদ্রোহীদের প্রতি কিছু সহানুভূতি ছিল, তাই তিনি দস্যু-তস্কর মনে করেও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লুটতরাজকে অনেকটা সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী কবি রতিরাম তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। বলাবাহুল্য, রতিরামের কাহিনীটিকে যথার্থ ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যেতে পারে।

রতিরামের কাব্যে দুর্ভিক্ষ বর্ণনা প্রাসঙ্গিক, তার মূল বক্তব্য অন্য। দেবীসিংহ ও তাঁর নিষ্ঠুর সহকারীরা খাজনা আদায়ের নামে প্রজাদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার

করেছিল, এবং প্রতিক্রিয়ায় যে প্রজাবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি দাঁড়ায় ঃ

সমকালীন উত্তরবঙ্গের ইজারাদার দেবীসিংহদিগের অত্যাচারে প্রজাসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে এক প্রজা বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। জয়দুর্গার সহযোগী রাজা রায়ের পুত্র শিবচন্দ্র রায়ও এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। জয়দুর্গার নির্দেশে তিনি রঙ্গপুরের সমস্ত জমিদারকে এক সম্মিলনে মিলিত করেন ও দেবীসিংহের অত্যচার ও প্রজাদের দুর্দশার কথা ওয়াকিফহাল করেন এবং তার প্রতিকারার্থে অবিলম্বে সক্রিয় পন্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করেন।

কিন্তু সমবেত জমিদারবর্গ অকস্মাৎ এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় শিবচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ হন ঃ

"কারো মুখে কথা নাই হেঁটমুণ্ডে রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র পুনরায় কয়।।
যেমন হারামজাদা রাজপুত ডাকাইত।
খেদাও সর্ব্বায় তারে ঘাড়ে দিয়া হাত।।"

কিন্তু তথাপি প্রার্থিত ফল হয় না। ফলে—

"জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই।।
মাইয়া হইয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে।।"

জয়দুর্গার এ ভর্ৎসনায় প্রার্থিত ফল ফললো বটে, তবে মনে হয় জমিদারদের তরফ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। কেননা, কবি লিখেছেন—

"চারি ভিতি হইতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলো আইল শুধু দেখিবারে মজা।।"

এই ভদ্রগুলিই হলেন সমকালীন ইংরেজভক্ত জমিদারগণ! আর ফলাফল ?
কবি বলেন—

"ইটার ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দেবীসিংহের বাড়ী হইল ইটার পাহাড়।।"

এরপরে কবি আর বেশিদূর অগ্রসর হন নি।

"খিড়কির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালেয়া গেল সেই বারো টিং।।

দেবীসিং পালাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা।।"

কবি রতিরাম আংশিকভাবে হলেও প্রজাবিদ্রোহের অতি সুন্দর পটভূমি রচনা করেছেন। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলতে হবে, সে চিত্র আসল অত্যাচারের তুলনায় নিতান্তই ফিকে।

দেবীসিংহের অত্যাচার যে কিরূপ নির্মম এবং অমানুষিক তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন রঙ্গপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন উপরিউক্ত রতিরামের গানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। সুধীসমাজের অবগতির জন্য তারই অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া যাচ্ছে।

তর্করত্ন মশায়ের ভাষায় ঃ

"জমিদারদিগের জমি নামমাত্র মুল্যে দেবীসিং বেনামিতে স্বয়ং কিনিতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই তখন জমিদারবর্গ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারো টাকা নাই, প্রহারে অপমানে, জর্জরিত হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন। তারপর কৃষকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল।...

দিনাজপুরে দেবীসিং অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন; হররাম (দেবীর অধীনস্থ কর্মচারী) রঙ্গপুরে একবিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল। এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবীসিংহের তাহাতেও মন উঠিল না।. . . জমিদারদিগের ত কথাই নাই; স্ত্রীলোকদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল।...

তাহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বংশদণ্ড অর্ধচন্দ্রাকারে চাঁচিয়া তাহার দুইপ্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশদণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত।....

মূর্ছিত হইয়া রমণীগণ ভূতলে পতিত হইলে রক্তস্রোতে ধরাতল সিক্ত হইত। তাহার পর দুর্বৃত্তেরা এই নিপীড়িত রমণীগণের ক্ষতবিক্ষত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মশাল ও গুলের আগুন ধরাইয়া দিত।

খৃস্টানপুঙ্গ গুডল্যাড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম দেবীসিংহই করেন, দেবীসিংহের কীর্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, উৎকোচের মায়া কে ত্যাগ করে ? যথাসময়ে গুডল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌছিল। তিনি শুনিলেন, নূরউদ্দীনকে প্রজারা নবাব পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে।"[১৭]

---

১৭. মহাপণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করতন্ সংগৃহীত জাগের গান। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ও আলোচিত, ৩য় ভাগ (রঙ্গপুর, ১৩১৯-১৯০৮), পৃ. ১৭৮-১৮০।
ওমৎ লিখিত "বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃ. ৬৫-৬৯।

॥ দশ ॥

প্রজাবিদ্রোহ ঃ ১৭৮৩

"In January 1783 the Rangpur cultivators suddenly rose into reballion and drove out the revenue officers, They set forth their grievances in a statement submitted to collector of the District.., One of their leaders assumed the title of Nawab, and a tax called ding kharcha or sedition tax was levied for the expences of the insurrection." —W.W. Hunter

বিদ্রোহী নবাবের নাম নূরউদ্দীন। হান্টার সাহেব তাঁকে স্বয়ংসিদ্ধ (selfstyled) নবাব বলেছেন। মতান্তরে, প্রজারাই তাঁকে নবাব নির্বাচিত করে তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আসলে এটি শুধু মাত্র রঙ্গপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্বে দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই বিদ্রোহও ছিল প্রধানত দেবীসিংহ তথা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। হান্টার সাহেব এই বিদ্রোহের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি একমাত্র নবাব নূরউদ্দীন ব্যতীত অন্য কোন বিদ্রোহী নেতার পরিচয় দেন নি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে। রতিরামের পূর্বোক্ত জাগের গানে এর আংশিক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। রতিরামের বিবরণ সত্য হলে আমরা প্রজা-বিদ্রোহের আরও দু'জন জননেতা ও নেত্রীর পরিচয় পাচ্ছি। তারা হলেন—মন্থনার মহিলা জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী ও রাজা রায়ের পুত্র শিবচন্দ্র রায়।

দেবী চৌধুরাণী নামের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইজন জননেতার নাম জড়িত আছে, যাঁরা এ-যাবৎ দস্যুনেতা বা লুটেরা ডাকাত দলপতি নামে পরিচিত। তাঁরা আর কেউ নন—মজনু শাহ্ ও ভবানী পাঠক। ভবানী পাঠকের সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মজনু শাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে পরে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা যাচ্ছে। এখানে নূরউদ্দীনের বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাক ঃ

নবাব নূরউদ্দীন

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রঙ্গপুরের কাজিরহাট, কাকিনা, টেপা ও ফতেপুরের চাকলার প্রজারা নবাব নূরউদ্দীনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা নূরউদ্দীনকে শুধু নেতা বলে নয়, 'নবাব' বলেও ঘোষণা করে। নবাব নূরউদ্দীন রাজা দয়াশীল নামে অন্যতর জননেতাকে তার দেওয়ান বা মন্ত্রীরূপে নির্বাচন করেন। তাঁদের আহবানে দিনাজপুর, ইদ্রাকপুর ও কোচবিহারের প্রজারাও এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। কেননা, এই সব এলাকার লোক ও দেবীসিংহ তথা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কুশাসনে ও অত্যাচারে জর্জরিত ছিল।

বিদ্রোহীরা প্রথমেই স্ব স্ব এলাকার 'রেভিনিউ অফিসার' মানে, নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতিকে অফিস থেকে বিতাড়িত করে, এমন কি এ কাজে বাধা দেওয়ায় তাদের অনেকেই বিদ্রোহীদের হাতে নির্যাতিত ও নিহত হয়।

সংবাদ পেয়ে দেবীসিংহ, হররাম প্রভৃতি বিশেষ ভীত হয়ে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের শরণাপন্ন হন।

গুডল্যাড সাহেব অবিলম্বে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল সাহেবকে বিদ্রোহ দমনের জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ পাঠান। লেফটেন্যান্ট সাহেব উত্তর দিকে এবং আর একজন সুবেদার দক্ষিণ দিক দিয়ে বিদ্রোহী প্রজাবাহিনীকে আক্রমণ করেন।

উপায়ান্তর না দেখে প্রজাগণ ডিমলার রাজা গৌরমোহনের আশ্রয় ভিক্ষা করে। গৌরমোহন তাদেরকে আশ্রয়দানে অস্বীকার করেন, ফলে প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে গৌরমোহনকে আক্রমণ করে এবং গৌরমোহন নিহত হন।

এভাবে ঘটনাটি বেশ গুরুতর আকার ধারণ করে লেফটেন্যান্ট সাহেব এবার ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বেপরোয়া আক্রমণ করে যেখানে যাকে পাওয়া যায় হত্যা করার নির্দেশ দেন।

নূরউদ্দীন তখন মাত্র পঞ্চাশজন অনুচরসহ মোগলহাটে অবস্থান করছিলেন, তাঁর দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিল। লেফটেন্যান্ট সাহেব অতর্কিতে মোগলহাট আক্রমণ করেন। মোগলহাটের যুদ্ধে নূরউদ্দীন গুরুতররূপে আহত হন ও দয়াশীল নিহত হন। পরদিন (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩ ঈ.) নূরউদ্দীনের মূল ঘাঁটি পাটগ্রাম আক্রান্ত ও বিজিত হয়। পাটগ্রামের যুদ্ধে অনেকেই হতাহত হয়। হান্টার সাহেবের বিবরণীতে দেখা যায়, ৬০ জন বিদ্রোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, অনেকেই বন্দী হয়। নূরউদ্দীন মোগলহাটে ভীষণভাবে আহত হন, তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে

পতিত হন। মতান্তরে, নুরউদ্দীন বন্দী হন। এভাবে প্রজাবিদ্রোহ প্রদমিত হয়। উল্লেখ্য যে, পাটগ্রামে কোম্পানীর সিপাহীগণ তাদের ইউনিফর্মের উপর সাদা পোশাক পরে ছদ্মবেশে হাজির হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীতেও সাদা পোশাক পরিহিত ইংরেজ পক্ষীয় বরকন্দাজের উল্লেখ আছে।

. কবি রতিরাম তাঁর পূর্বোক্ত জাগগানে এই প্রজাবিদ্রোহের আর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কৌতূহলজনক বলে কাব্যাংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করছি। কবি লিখেছেন–

"সব জমিদারক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
দেবীসিং হররাম।
যেমন কঠিন হয়্যা মোটা হয়
উঞ্চা হয়্যা করে নাম।।
সেই রূপে বুঝি সৌগ অঙ্গ হতে
সার নিয়া চুঁচি দুটা।
বড়ই কঠিন মাথা উঁচা করি
হৈছে বুঝি মোটা সোটা।।
শিবচন্দ্রের হাতে যেমন হইল
সে দুটার অধঃপাত।
সেইরূপ পাপ এ দুটার বুঝি
করিবে বন্ধুয়ার হাত।।
এক দিকে চুঁচি আর দিকে পাছা
দু-জনে লইল টানি।
আছে কিনা আছে বোঝা নাহি যায়
আমার কমর খানি।।
একদিকে যেমন মন্থন লইল
আর দিকে বামন ডাঙ্গা।
ফতেপুর এখন আছে কিনা আছে
সব দিক হইজে ভাঙ্গা।।"

কাব্যাংশে নারীদেহের বিভিন্ন যৌনাঙ্গগুলিকে বিদ্রোহী এলাকার সঙ্গে তুলনা করে আদিরস বর্ণনাচ্ছলে রূপকের মাধ্যমে প্রজাবিদ্রোহে শিবচন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[১৮]

১৮. মৎলিখিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

এখানে দেবীসিংহ হররামকে বিদ্রোহী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং শিবচন্দ্রকে সেই বিদ্রোহ দমনকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি মন্থনা, বামনডাঙ্গা, ফতেপুর প্রভৃতির নাম করা হয়েছে। শিবচন্দ্র ও দেবী চৌধুরাণী ছিলেন এই সব এলাকার অধিপতি। খুব সম্ভব, নবাব নূরউদ্দীনও রঙ্গপুর জিলার কোন বিখ্যাত জমিদার হবেন। কেননা, তা না হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজা তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করতে পারত না। নূরউদ্দীন সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় হান্টার সাহেব বা অন্য কোন ইংরেজ মনীষী এই নেতার কোন পরিচয় দেন নি।

দেবীসিংহ

দেবীসিংহও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর পরিচয় ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্য পরিচয় হল—তিনি কোম্পানীর নিযুক্ত রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহভাজন এবং দিনাজপুরের দেওয়ান (অর্থমন্ত্রী) ছিলেন।

এই সময়ে কোম্পানী পূর্বাপেক্ষা উচ্চতর হারে খাজনায় রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং ইদ্রাকপুর জিরাত্রয় ইজারা দেয় (১৭৮১—১৭৮৩ ঈ.)। ইজারাদার হন স্বয়ং দেবীসিংহ জনৈক মুসলমানের বেনামীতে। রঙ্গপুরের কুখ্যাত জমিদার কোম্পানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র বাবু হররাম সেন হন তাঁর সহকারী। এঁদেরই অত্যাচারের কাহিনী রতিরামের গানে বিবৃত হয়েছে।

কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, প্রজাবিদ্রোহের অবসানে অপরাধীদের বিচার হয়। উচ্চ পর্যায়ের দু'টি বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যে দেবীসিংহের অত্যাচারের ফলে প্রজাবিদ্রোহের সূত্রপাত সেই দেবীসিংহ শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন। শুধু মাত্র সহকারী হররামের এক বৎসরের কারাদণ্ড হয় এবং পরে তাঁকে জিলা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পাঁচজন বিদ্রোহী নেতাকেও বহিষ্কৃত করা হয়।[১৯]

এই মামলা প্রায় ছয় বছর ধরে চলে। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে এর রায় হয় (১৭৮৯ ঈ.)। উল্লেখ্য যে, ঠিক এই সময়েই লর্ড হেস্টিংসের অযোগ্যতা বিষয়ক (Impeachment) মামলার বাগ্মীপ্রবর এডমণ্ড বার্ক উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহ ও তার কারণ সম্পর্কে লোমহর্ষক বিবরণী দান করেন। ১লা ডিসেম্বর ১৭৮৩ সালে এই স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

---

১৯. হররাম ছিলেন ইংরেজমহলে সুপরিচিত ব্যক্তি। রঙ্গপুরের 'ডিমলা'র বিখ্যাত জমিদার পরিবারের তিনি ছিলেন আদিপুরুষ। তাঁর বংশ পরিচয় লেখক তাঁর এ জমিদারী অর্জন সম্পর্কে স্পষ্টই লিখেছেনঃ "এই সময় (দুর্ভিক্ষ সময়ে) হররাম প্রায় চল্লিশখানি মৌজা খরিদ করিয়া লাইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি বর্ধিত করিলেন। এই সব মৌজার কতকগুলি তাঁহার পুত্র রামজীবনের নামে খরিদ হয়।" ১৭৯০ ঈসায়ীতে তাঁর মৃত্যু হয়। (বংশ পরিচয়, পৃ. ৮৭।)

ওয়ারেন হেস্টিংস
বনাম
এডমন্ড বার্ক

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) প্রথমে বাংলার গভর্নর বা ছোটলাট হয়ে আসেন ১৭৭২ সালে; পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৭৩ সাল থেকে তিনি বড় লাটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কুশাসনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, এবং শুধু বাংলাদেশের ইংরেজগণ নয়—সমগ্র ব্রিটিশ জাতি তাঁর অতীত কীর্তিকলাপের কথা শুনে শিউরে ওঠে। বলাবাহুল্য, হেস্টিংসের দুর্নীতি ও কুশাসনের বিষয়ে যতগুলি অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লোমহর্ষক বিষয় ছিল বাংলায় কোম্পানী শাসনের জঘন্যতা ও রঙ্গপুরের নৃশংস আচরণ (atrocities of Rangpur)। রঙ্গপুরের দেবীসিংহ-হররামের নৃশংস অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে বাঙালি সন্তান সেদিন যে মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, কে জানে তাতে বিশ্ববিধাতার আপন আসন টলে উঠেছিল কিনা!

হেস্টিংস অবশ্য সকল অভিযোগ থেকেই মুক্তি পেয়েছিলেন ; কিন্তু বাগ্মীপ্রবর বার্কের ভাষায় বলা যায়—"The ultimate Judges under God of all our actions."[২০]

বস্তুত রঙ্গপুরের প্রজা-বিদ্রোহের ইতিহাস এই উপমহাদেশের ইতিহাসে ইংরেজ-জাতির এক দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস, হেস্টিংস বা দেবীসিংহ তার নিমিত্তের ভাগী মাত্র, সত্যের অনুরোধে এ-কথা বলতে হবে।

বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, দেবীসিংহ-হররাম প্রভৃতির অত্যাচার সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও বিচারের জন্য যে কমিশনগুলির ব্যবস্থা হয়েছিল তার একটির প্রধান ছিলেন মিঃ প্যান্টারসন নামক জনৈক মহামতি ইংরেজ মনীষী। তিনি সরেজমীন তদন্ত করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তা তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

> "আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদিগের উপর কঠোর অত্যাচার, এবং তাহারই জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হয়, সে-কথা সাধারণভাবে বিবৃত করিয়াছি,

২০. P. J. Marshall. The impeachment of Warren Hastings. (Oxford, 1955), P. 85-87.

তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রতিদিনের অনুসন্ধানে আমার মন্তব্য আরও দৃঢ় করিতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, তাহা হইলে আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের উপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে। ইহা যে কেবল কতিপয় প্রজার উপর হইয়াছিল এমন নহে, সমস্ত দেশেই এরূপভাবেই অত্যাচার বিস্তৃত হয়। মনুষ্য চিরকাল পরাধীন থাকিলেও যখন অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে তখন তাহার প্রতিবিধানের জন্য তাহাকে অগত্যা উত্থিত হইতে হয়। আপনারা এই সমস্ত প্রজাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন অসম্ভব কর আদায়ের জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াও অর্ধাংশের প্রতিশোধ হইল না, তাহার উপর আবার তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। ইহার উপর যখন তাহাদের পরিবারের পবিত্রতানাশ ও জাতিনাশের অত্যাচার হইতে লাগিল, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের কি করা উচিত? আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, এতদ্দেশীয়েরা আপনাদিগের স্ত্রী ও জাতির উপর যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে তাহারা এরূপ অবস্থায় কতদূর সহ্য করিতে সক্ষম হয়।"[২১]

নিজের দেশের এবং স্বজাতির শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত কিন্তু প্যাটারসনের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যসন্ধ ইংরেজ সন্তানের পক্ষে এই মন্তব্য নিতান্তই স্বাভাবিক। প্যাটারসন তাঁর এই মন্তব্যের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও অনবহিত ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি এই কমিশনের কার্যে যোগদান করেই রঙ্গপুর থেকে যে তেজস্বী বাণী তাঁর স্বদেশবাসীদের জন্য প্রেরণ করেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যথা—"রঙ্গপুর ও দিনাজপুর প্রদেশের প্রজাগণের উপর রাজস্ব অনাদায়ের জন্য যেরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত না করিয়া, তাহাদিগের চির যবনিকাবৃত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার নিকট যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, ন্যায়, মনুষ্যত্ব এবং গভর্নমেন্টের সম্মানের জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার স্রোত পুনঃ প্রবাহিত না হয়, তজ্জন্য আমাকে সমস্তই অবগত করাইতে হইবে।"[২২]

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ মহানুভব ব্যক্তির মহত্ত্বও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু তার সত্যানুসন্ধান ও সত্য প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের খেশারাত স্বরূপ তাকেও অভিযুক্ত

২১. নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী (কলিকাতা, ৩য় সং ১৩১৬, সাল-১৯০৯); পৃ. ৫৭০-৭১ (impeachment of Warren Hastings, Vol. 1. p.p. 194-95. থেকে গৃহীত)।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮।

হতে হল। "প্যাটারসন হেস্টিংসের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি তাহার দোষক্ষালনের সাক্ষ্যসংগ্রহের উপায় করিতে বলিলেন। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া পুনর্বার রঙ্গপুর প্রদেশে গমন করিতে হইল। যেখানে তিনি দেশের রক্ষক হইয়া গমন করিয়াছিলেন, যাহার নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া (বলিয়া) প্রজারা শান্তিলাভ করিয়াছিল, যাঁহার ন্যায়ানুমোদিত অনুসন্ধানে প্রজাদিগের তাপদগ্ধ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সুবিচারের আশা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই প্যাটারসনকে অপরাধীর ন্যায় সাক্ষ্যসংগ্রহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহারা ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িল। এক সময়ে যিনি শাসনকর্তারূপে গমন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া প্রজাগণ ভীত হইয়া তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেও সাহস করিতে পারিল না। তাহার পর হেস্টিংস সাহেব কতিপয় অল্পদিনের নিযুক্ত কর্মচারীকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া প্যাটারসনের অপরাধের তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। যিনি এক সময় কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাহার উপর কমিশনার নিযুক্ত হইল।"[২৩]

বলাবাহুল্য, একে শুধু প্যাটারসনের দুর্ভাগ্য বলে গণ্য করলে চলবে না, বরং পরাধীন জাতির ভবিতব্যই বলা যেতে পারে, প্যাটারসনের শাস্তি তার উপলক্ষ্য মাত্র।

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫।

॥ এগার ॥

ফকীর নেতা মজনু শাহ্

"দলবল দেখিয়া সবের আক্কেল হইল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম।।"

—পঞ্চানন দাসস্য।

তাঁর আসল নাম কি, জানা যায় না; সমকালীন সরকারী কাগজ-পত্রে যে নাম পাওয়া যায়, সে হল 'মজনু শাহ', 'মাজিনু শাহ', 'মানজেনুছ,' 'মাজেনু শাহ,' 'মাড্জন্স্‌ছ' ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, বিদেশী সাহেব লেখকদের হাতে পড়ে 'মজনুন শাহের' নামের এই দুর্দশা হয়েছে। আমরা তাঁকে মজনু শাহ্ বলেই চিহ্নিত করলাম।

আমরা আগেই দেখেছি—'মজনুর কবিতা' লেখক মজনুকে দস্যুনেতা রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তাঁকে 'রাজ-দরবীশ' রূপেই চিত্রিত করেছেন। সমকালীন সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণী অনুযায়ী তাঁকে 'রাজ-দরবীশ' না বলে 'রাজদস্যু' বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। আসলে কিন্তু মজনু শাহ 'রাজ-দরবীশ'ও নন—রাজদস্যুও নন, তিনি একজন সূফী ফকীর মাত্র। তাঁকে বড়জোর 'ফকীর নেতা' বলা যেতে পারে। ঈসায়ী সতেরো শতকের শেষে অথবা আঠারো শতকের প্রথমভাগে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের আলোয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেওয়াতে, মতান্তরে, কানপুরে, তাঁর জন্ম হয় এবং ওফাত হয় সমকালীন বাংলাদেশের উত্তর এলাকার রঙ্গপুর বা দিনাজপুর জিলার কোন এক স্থানে মতান্তরে, মাখনপুরে ঈসায়ী ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে।[২৪] তাঁর দাফন-কাফনও করা হয় তাঁর জন্মভূমি মেওয়াত জিলাস্থিত ধুলী নদীর দক্ষিণ তীরে। আজও এই উপমহাদেশের বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর পবিত্র মাযার যিয়ারত করতে যায়।

তাঁর প্রথম বাংলায় আগমনের কারণ ও সময় সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনকিছু জানা যায় না, তবে যতদূর মনে হয়, যৌবনে বিশ্ববিখ্যাত সূফী সাধক হযরত বদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদারের সিলসিলাভুক্ত ফকীরী মতে মুরীদ হয়ে একদিন তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে

---

২৪. Ghose, P. 110.
"Majnu Shah died in March or May. 1781 (According to different reports) at Makhanpur and his bones were carried to a famous burrial place in the country of Mawat lying to the southward of Dholly".

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলায় এসে সেই যে বাংলা ভূমির প্রেমে পড়েছিলেন, সারা-জীবনেও তা আর ভূলতে পারেন নি। তখন বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। মুসলিম নবাব-বাদশাহদের দরবারে ফকীর-দরবীশদের বিশেষ কদরও ছিল। এই ফকীরদের সাহচর্যে এসে তিনি ফকীরকেই হয়ত জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁকে তথাকথিত দস্যুনেতা রূপে পরিচিত হতে হয়েছে। কি করে হল, সে কাহিনী যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি মর্মান্তুদ।

হযরত সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানা (র)

হযরত শাহ সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানা (র) ছিলেন বিখ্যাত মুগল সম্রাট শাহজাহানের মধ্যম পুত্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার শাহ মুহম্মদ শুজার পীর। হযরত শাহ বুরহানা আবার ছিলেন এই উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক সূফীসাধক হযরত বদীউদ্দীন (বদীটেদ্দিন নয়) শাহ-ই-মাদারের সিল্‌সিলাভুক্ত ফকীর।

এই উপমহাদেশে ইসলামী সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত ফকীর-দরবীশদের মধ্যে যাঁরা খানদানী ফকীর নামে পরিচিত শাহ্-ই-মাদারের সম্প্রদায় তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।[২৫] এই সম্প্রদায় সাধারণত 'তাবাকাদী' ও 'মাদারী' নামে পরিচিত। হযরত হাসান মুরিয়া বুরহানার নামেও একটি সিল্‌সিলা জারি হয়েছিল, এই সিল্‌সিলা 'বুরহানা' (হযরত হাসানের নামে) খান্দান নামে পরিচিত। 'বুরহানা' শব্দের অর্থ 'নগ্ন'। মনে হয় এই খানদানের ফকীরদের বেশভূষা ও চালচলনের অদ্ভুতত্বের জন্য নামকরণ হয়েছে।

ফকীর মজনু শাহ ছিলেন এই বুরহানা ফকীর সম্প্রদায়ের নেতা। প্রধানত এঁরই নেতৃত্বে বিখ্যাত 'ফকীর-বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, এই উপমহাদেশের ফকীর-দরবীশদের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাল তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, মুসলিম বাদশাহ্‌দের দরবারে এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানাকে সুলতান শুজা এতই ভক্তি করতেন যে, তাঁর সম্মানার্থে তিনি যে সনদ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে প্রায় স্বাধীন নৃপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল (১৬৫৯ ঈ.)। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য সেই বিখ্যাত সনদের অংশবিশেষ তুলে ধরছি ঃ

"দফা ঃ ১

ব্যক্তিগত ভ্রমণই হোক, আর হিদাআতের জন্যই হোক, শহর-বন্দ-গ্রাম নির্বিশেষে যখন যেখানেই আপনি যেতে চান না কেন, আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার শক্তিজ্ঞাপক নিদের্শনাদি যথা ঝাণ্ডা, প্রতীক, পতাকা, দণ্ড, বাদ্য, মাহি, মুরাতিল ইত্যাদি সঙ্গে নিতে পারবেন।

*　　　　*　　　　*

২৫. এই সম্প্রদায়গুলির নাম যথাক্রমে-চিশতী, সুহরাওয়ার্দী, কাদিরী, তাবাকাদী, নকশাবন্দী ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে এই শ্রেণীর মানে, মাদারীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

দফা ঃ ৪

বাংলা বিহার উড়িষ্যার যে-কোনো স্থানের পীরপাল অথবা লাখিরাজ যমীন ব্যতীত যে-কোনো যমীন অথবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

দফা ঃ ৫

দেশের যে-কোনো এলাকা দিয়ে আপনি যাবেন, স্থানীয় জমিদারগণ ও প্রজাগণ আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ্ করতে বাধ্য থাকবেন।

*　　　　*　　　　*

দফা ঃ ৭

আপনার উপর কোনোরকমের খাজনা বা সেস্ ধার্য করা হবে না।"

হযরত হাসানের পরে এই সম্প্রদায়ের নেতা কে হয়েছিলেন জানা যায় না, তবে মজনু শাহের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাম্প্রদায়িক মর্যাদা থেকে মনে হয়, তিনিই তাঁর সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুলতান মুহম্মদ শুজা হযরত হাসানকে যে মর্যাদা দান করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা যে চালু ছিল, এরূপ অনুমান করতে দোষ নেই ; কেননা পরবর্তী আলীবর্দী খানের আমল পর্যন্ত দরবারে পীর-ফকীরদের অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান ছিল দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত পীর-ফকীরদের খিদ্‌মতে পীরোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তিদানের ইতিহাস এদেশে কোনো নতুন কথা নয়। বলাবাহুল্য, পীরের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীগণ এই সম্পত্তি বংশানুক্রমে বা শিষ্যানুক্রমে ভোগদখলের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হতেন।[২৬] মজনু শাহের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয় না।

---

২৬. এই শ্রেণীর সম্পত্তি মদদ মাস, লাখিরাজ, আয়মা, ইত্যাদি নামে অভিহিত।

মজনু শাহের বাংলায় আগমন

মজনু শাহ্ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে এসেছিলেন, কিভাবে সর্বপ্রথমে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, তার যথার্থ চিত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে সমকালীন সরকারী কাগজ-পত্রে সংরক্ষিত বিবরণাদি থেকে জানা যায়, তিনি প্রথমে তীর্থ ভ্রমণব্যপদেশে এদেশে আসেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুসারীরাও বিপুল সংখ্যায় বাংলায় আসেন।

বৎসরের এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবারেই তারা আসা-যাওয়া করতে থাকেন। তারা প্রধানত বিভিন্ন প্রাচীন আউলিয়া-দরবীশদের দরগাহ্‌কে কেন্দ্র করে, যথা, মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতানের দরগাহ্ (বগুড়া), পাণ্ডুয়ার শাহ সূফী সুলতান দরগাহ্ ইত্যাদিতে সমবেত হতেন। শুধু বাংলা মুলুকে নয়, এই উপমহাদেশের সকল আউলিয়া-দরবীশের দরগাহ্‌তেই তাঁদের যাতায়াত ছিল, কিন্তু আঠারো শতকের বাংলাদেশে বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় তাঁদের এই পর্যটনে বাধা পড়ে, এমন কি তাদের গতি-বিধিও নিয়ন্ত্রিত হয়। চিরস্বাধীন ফকীর-দরবীশগণ তাতে তাঁদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল মনে করেন। কিন্তু এই ঘটনা যখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনারূপে পরিগণিত হয় ; তখন-ই ফকীর সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এরপরে আসে তাদের লাখিরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির পালা। এতদিন তারা রাজকীয় সূত্রে প্রাপ্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে আসছিলেন, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাতেও হস্তক্ষেপ করার ফলে এ বিদ্রোহ রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপান্তরিত হয়।

রাণী ভবানীর নিকট মজনুর পত্র

সমকালীন রাজশাহীর মহারাণী ভবানীর কাছে লিখিত মজনুর একটি পত্রে এ বিষয়ের আভাস আছে মনে করা যায়। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"We have for a long time begged and been entertained in Bengal and we have long continued to worship God at several shrines and alters without ever once abusing or oppressing any one. Nevertheless, last year 150 Fakirs were without cause put to death. They had begged in different countries and the clothes and victuals which they had were lost. The merit which is derived and the reputation which is procured from the murder of the helpless and indigent need not be declared. Formerly the Fakirs begged in separate and detached parties but now we are all collected and beg together. Displeased at this method they obstruct us in visiting the shrines and other places--this is unreasonable. You are the ruler of the country we are Fakirs who pray always for your welfare. We are full of hopes."[২৭]

অর্থাৎ মজনুর নালিশ এই যে, অকারণে বৃটিশ কোম্পানী তাদের তীর্থযাত্রায় শুধু বাধা সৃষ্টিই করেনি তাঁর অনুসারী একশ' পঞ্চাশ জন ফকীরকে ইতিমধ্যেই হত্যা করেছে। মজনু জানতে চেয়েছেন, এই হত্যা করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় ?

পত্রখানি লিখিত হয়েছিল ১৭৭২ সালের প্রথম ভাগে।

নাটোরের রাণী ভবানী এই নালিশের কি জবাব দিয়েছিলেন জানা যায়নি। তবে যে মজনু এই ঘটনার পর আর নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাঁর দলকে সুসংগঠিত করে ইংরেজ কোম্পানীর মুকাবিলা করতে তৈরি হয়েছিলেন, সমকালীন সরকারী নথিপত্র থেকে তার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য বাংলাদেশে সন্ন্যাসী-ফকীরদের সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষের এটিই প্রথম নমুনা নয়, তবে যতদূর জানা যায়, মজনু ও তাঁর সম্প্রদায় যে সংঘবদ্ধভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, এই ঘটনা থেকেই তার প্রথম সূত্রপাত হয়। বগুড়ার কালেক্টর মিঃ গ্লাডউইন মজনু সম্পর্কিত তাঁর বিবরণীতে বিশেষ করে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছেন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে।

---

২৭ Ghose. P. 47.

বাংলার ফকীর হামলাকারী দল

বাংলায় ফকীর হামলাকারী দলের হামলা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল বলা মুশকিল, তবে যতদূর জানা যায় ১৭৬৩ সাল কিংবা তারও আগে থেকে তার সূত্রপাত হয়। ১৭৬৩ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, বাখেরগঞ্জে (বরিশালে) একদল ফকীর তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ কেলীর জীবন বিপন্ন করে তুলে। তারা সেখানে নানা উপদ্রব ও লুটপাট করে।

ঐ একই বৎসরে মিঃ ক্লাইভ বলেন, একদল উচ্ছৃঙ্খল ফকীরদল ঢাকা ফ্যাক্টরী আক্রমণ ও দখল করে।

ঐ সময়ে বর্তমান রাজশাহী শহরের বিখ্যাত রামপুর বোয়ালিয়ার ফ্যাক্টরী (বড় কুঠি ?) আক্রান্ত হয়।[২৮]

মিঃ বেনেট ছিলেন ঐ সময়ে রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠির অধ্যক্ষ (ফ্যাক্টর)। সরকারী বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৭৬৩ সালে মিঃ বেনেট বিরহিমপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁকে সেখান থেকে বিশেষ কারণে গ্রেফতার করে পাটনায় পাঠানো হয়। পাটনাতেই তিনি নিহত হন উক্ত বছরেই। তাই রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠি আক্রমণ নিশ্চয়ই এই ঘটনার আগে ঘটেছিল। সে যা-ই হোক ১৭৬৪ সালে কুঠিটি দ্বিতীয়বার ফকীরদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

এরপর ১৭৬৬ সালে কোচবিহারে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এই ঘটনার সঙ্গেও ফকীর-সন্ন্যাসীরা জড়িত হয়ে পড়ে। আগেই সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়ে তথাকথিত নবাবের বাঙালির সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, বহুকষ্টে তা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এটিই ছিল সর্বপ্রথম সিপাহী বিদ্রোহ। এর পরেই শুরু হয় ফকীর বিদ্রোহ। অবশ্য ফকীর নেতা মজনু শাহের আন্দোলনের সঙ্গে এই সব লুটপাটের কি সম্পর্ক ছিল বলা মুশ্‌কিল, কেননা, সরকারী বিবৃতিগুলিতে ফকীর ও সন্ন্যাসী নামগুলি এমন হালকা এবং আলগাভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, তার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা করাও মুশ্‌কিল। অথচ এই আন্দোলন প্রধানত মুসলমান ফকীরদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নিয়েই তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সর্বসম্মত

---

২৮. Ghose. P. 43-44.
রামপুর বোয়ালিয়া রাজশাহী শহরের পূর্বনাম। বর্তমানেও বোয়ালিয়া রাজশাহীর সদর থানার নাম এই প্রাচীন নামের স্মৃতি বহন করছে।

নেতা ও উদগাতা ছিলেন মজনু শাহ ফকীর। বলাবাহুল্য, এই ফকীর নেতার নাম সুস্পষ্টভাবে প্রথম উল্লেখ করেন, মিঃ রেনেল এতদ্‌সম্পর্কিত তাঁর একটি বিবৃতিতে (১লা মার্চ, ১৭৭১ ঈ.)। তাতে তিনি স্পষ্ট বলেন যে, তিনি ফকীর নেতা মজনুকে ঘোড়াঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে মস্তানগড়ে যেতে দেখেছিলেন। ঘোড়াঘাটে ফকীরদলের সঙ্গে এই সময়ে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মজনু শাহ্ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। মনে হয়, রাণী ভবানীর কাছে লিখিত চিঠিতে এই ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। মস্তানগড় বগুড়া জিলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত দরগাহ্। অতি পূর্বকাল থেকেই এখানে বিখ্যাত মুসলিম ওলী-দরবীশদের লীলাস্থল। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে হযরত শাহ সুলতান 'মাহীসওয়ার' নামে এক বিখ্যাত দরবীশ সমকালীন হিন্দু রাজা পরশুরামকে পরাজিত ও নিহত করে মস্তানগড় জয় করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইতিপূর্বে স্থানটি 'পুন্দ্রনগরী' নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য ফকীর নেতা মজনু শাহ্ও এখানে একটি গড় বা সেনানিবাস নির্মাণ করে এখান থেকেই ফকীর আন্দোলন পরিচালনা করতেন বলে সরকারী সূত্রেও জানা যায়। তাই এর নাম ফকীর মজনু শাহের নামেও 'মস্তানগড়' হওয়া অসম্ভব নয়।[২৯]

সে যা-ই হোক, ফকীর মজনু শাহ্ আত্মরক্ষার জন্য মস্তানগড়ে আশ্রয় নেন। অতঃপর এই মস্তানগড়েই তিনি একটি স্থায়ী সেনানিবাস (Cantonment) গড়ে তোলার জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। কিন্তু কেন ? এই ফকীর মজনু তাঁর ফকীরী ভুলে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কেল্লা নির্মাণ করে এক অনিশ্চিত দুর্গম পথে পা বাড়ালেন ?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে যতদূর জানা যায়, পূর্ববর্ণিত ঘোড়াঘাটের নিকটবর্তী স্থানের দুর্ঘটনা থেকে মজনু বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং তারই প্রতিকারার্থে এই বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নাটোরের স্বনামখ্যাতা মহারাণী ভবাণীর নিকট লিখিত মজনুর পত্রে মজনুর যে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী সময়ে মস্তানগড়ে কেল্লা বা সেনানিবাস নির্মাণের মাধ্যমে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মজনু শাহের এই কেল্লার প্রাচীন স্থানটি ব্যতীত তেমন কোন ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই। তবে সমকালীন সরকারী কগজ-পত্রাদিতে মজনুর কেল্লা নির্মাণের কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হয়েছে।

---

২৯. বলাবহুল্য স্থানটি মহাস্থান নামে পরিচিত। এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয়, ফকীর শাহ্ সুলতানের আগে থেকেই এটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ হিসেবে পরিচিতি থাকায় তারা মহান স্থান যা মহাস্থান নামে চিহ্নিত করে থাকবে। মতান্তরে এটি 'মহাস্নান' শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর প্রাচীন নাম পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্র নগরী। স্মরণাতীত কাল থেকে স্থানটি পুণ্ড্রদেশ তথা গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। প্রাক-ঈসায়ী তিনশতকে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখে 'পুড় নগর' (পুণ্ড্র নগর) নামটি পাওয়া যাচ্ছে।

মস্তানগড়ে মজনু

১৭৭৬ সালের ঘটনা। মিঃ গ্লাডউইনী বগুড়া জিলার তত্ত্বাবধায়ক (কালেক্টর) নিযুক্ত হয়ে বগুড়ায় আসেন (১৫ই মার্চ)। এসেই তিনি বিখ্যাত ফকীর নেতা মজনুর বগুড়া উপস্থিতির কথা জানতে পারেন। মজনু আগামী ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য মহাস্থান-মেলায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন।[৩০]

মিঃ গ্লাডউইন মজনু-সম্প্রদায় কর্তৃক উৎপাতের আশংকা করে প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে কিছু সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান। কাউন্সিল কোন সৈন্য সাহায্য দিতে অপারগতার কথা জানালে মিঃ গ্লাডউইন এতই ভীত হয়ে পড়েন যে, তিনি অবিলম্বে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে এক কড়া চিঠি লিখেন। চিঠিটি নিম্নরূপ ঃ

"It is with concern gentlemen, that I perceive you think that I entertain unnecessary apprehensions for Shaw Majinoo. Had it regarded only my own personal safety. I should never have made any application for assistance, but as ryots are greatly alarmed and in my opinion with just cause . I thought it my duty to make you such representation. He did not come this time attended merely Bengal (i) rabble but had with him a number of well armed Rajputs. He had began to build a cantonment a Mustangur, publicly avowing that he intended staying there all the rainy season and was laying in a stock of provisions when a report prevailing that a force was coming against him from Denagepore he crossed the Bogra [Karotowa] with a great pricipitation and did not halt till he reached the Berhamputtah (Bramhaputra river). Two or three days after his arrival at mustangur I sent Cawzy to require from him, in my name what were his intentions he said he was come to recover some bond debts that he should remain peaceably at Mustangur provided he was not molested

৩০. এই মেলা প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হত; এখনও তার ধারা জারি আছে। বলাবহুল্য, বিখ্যাত দরবীশ হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (র)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

but that if he offered to attack him, he was not afraid but ready to oppose."[৩১]

তরজমা ঃ

"ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা ভাবছেন, আমি মজনু শাহ সম্পর্কে বড় বেশি ভাবছি, কিন্তু আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটি সত্যি সত্যিই বড় উদ্বেগজনক। এ যদি শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা হত, আমি নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য কোন আবেদন করতাম না ; কিন্তু প্রজাগণ বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, তাই কর্তব্যবোধে আমি আপনাদের সাহায্যের জন্য আবেদন করতে বাধ্য হয়েছি।

সে এবার শুধুমাত্র কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল বাঙালি সাথে নিয়ে আসেনি, রীতিমত সশস্ত্র রাজপুত বাহিনীর নায়ক হিসেবে এসেছে। সে এখানে একটি সেনানিবাসও গড়ে তুলতে শুরু করেছে এবং প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে যে, এবার সারা বর্ষাকাল সে এখানে থাকবে। সেজন্য খাদ্যদ্রব্যাদিও সংগ্রহ করছে। দিনাজপুর থেকে তার বিরুদ্ধে একদল সেনাবাহিনী পাঠানো হচ্ছে শুনে সে অনেক কষ্টে করতোয়া পাড়ি দিয়ে সোজা ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে গেছে ; পথে কোথাও বিশ্রাম করেনি।

তার আসার দুই বা তিনদিন পরে তার কাছে একজন কাযী (Cawzy) পাঠিয়ে তার অভিপ্রায় জানতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু সে জানিয়েছে তার কিছু বন্ধকী দেনা-পাওনা আছে। শান্তিতে মস্তানগড়ে থাকতে দিলে সে সেগুলি আদায় করে নিয়ে যাবে ; আর যদি বাধা দেওয়া হয়, সে ভয় পায় না ; বরং বিরোধিতার জন্য সে প্রস্তুত।"

মিঃ গ্লাডউইনের এ চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মজনু নিতান্ত দুর্বল হাতে অসি ধারণ করেন না। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করতে চান, কিন্তু তাতে যদি বাধ সাধা হয়, তিনি বরদাশত করতে রাযী নন। মিঃ গ্লাডউইনের এ চিঠি থেকে আরও জানা যায়, মজনু লগ্নী কারবার বা টাকা-পয়সা লেন-দেনের কারবার করতেন। মস্তানগড়ে তাঁর কিছু খাতক ছিল, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেই তিনি এসেছিলেন। অবশ্য দরগাহ্ যিয়ারতও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই টাকা দাদন ও পণ্য-দ্রব্যাদির ব্যবসা তখন ভদ্রলোকেরই ব্যবসা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারী এবং তাঁদের দেখাদেখি ছোট ছোট কর্মচারীরা ও গরীব চাষী-মজুনদের মধ্যে এই টাকা ধারের ব্যবসা করতেন। তাই এ-ব্যাপারে মজনুকে দায়ী করে লাভ নেই। কোচবিহারের ইতিহাস লেখক এ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বিবরণী দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, স্বয়ং কোচবিহারের মহারাজাই ক্যাপ্টেন ডানকান্‌সন্‌-এর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। এবং কৌতূহলের

৩১. ঘোষ, পৃ. ৭২-৭৩।

বিষয়, মিঃ ডানকান্‌সন্‌কে তাঁর মূলের সঙ্গে অতিরিক্ত সুদ পেয়েও নাকি খুশি হননি। ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ

"১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান ডানকান্‌সন্‌ রাজাকে ১৪,৯০১ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এক বৎসর পরে ২১,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই।"[৩২]

অবশ্য পরবর্তীকালে ডানকান্‌সন্‌ নাকি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সে যা-ই হোক, লাভে টাকা ধার দেওয়া বা দাদন দেওয়া ও নেওয়া কোনটাকেই তখন অপরাধজনক বলে মনে করা হতো না। আর তাছাড়া--সমকালে কোচবিহারের প্রজাকুল এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, অতিরিক্ত সুদে ইংরেজ কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের টাকা ধার নেওয়া ছাড়া অন্য গত্যন্তরও ছিল না। কৌতূহলের বিষয়, এই সুদের হার টাকায় মাসিক দুই আনা থেকে তিন আনা পর্যন্ত উঠানামা করত। এবং বলাবাহুল্য, এই হার ছিল ডানকান্‌সনের অধীনস্থ্ সিপাহীদের। কথিত আছে ঃ

"তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা প্রতি টাকায় মাসিক দুই আনা তিন আনা সুদে কৃষকগণকে টাকা ধার দিত এবং বলপূর্বক তাহা আদায় করিয়া লইত। উল্লিখিত নানারূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত বহু প্রজা দেশত্যাগী হইয়াছিল। লোকে টাকা ধার করিতে গেলেই উত্তমর্ণেরা তাহাদিগকে প্রায় সর্বস্বান্ত করিয়া তুলিত। সুদের পরিমাণ সাধারণত শতকরা ৭২ টাকার ন্যূন ছিল না ; এবং অবস্থা-ভেদে অনেক ক্ষেত্রে ৩৬০ টাকা (অর্থাৎ প্রতি শত টাকায় দৈনিক এক টাকা করিয়া) পর্যন্তও সুদ লওয়া হইত।"[৩৩]

তাই যদি হয়, তাহলে শুধু বেদীসিংহের দোষ দিলে চলবে কেন ? একজন ছোটখাটো কোম্পনীর সিপাহীই বা কম ছিল কিসে ? তার উপরে দেশীয় রাজা বা জমিদার-কর্মচারিগণও ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে মজনুর আবির্ভাবে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ও তার অনুগৃহীত জমিদার মোসাহেবদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান পরিচালনা যে নেহায়েৎ আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র ছিল না, এ-কথা সহজেই অনুমেয় !

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, মজনুর অত্যাচারে নাকি বাংলাদেশের কয়েকটি জমিদার পরিবারও জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে অন্যত্র বসবাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বগুড়ার কড়াই নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ও টেপা ঝাঁকেরের শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের পরিবার দুটি।

রায় যামিনী মোহন ঘোষের অনুসরণে মূল কাহিনীর উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে।

---

৩২ আমানত উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।
৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী

বগুড়া জিলার কড়াই গ্রামের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মুমিনশাহী ও জাফরশাহী পরগনাদ্বয়ে প্রচুর ধন-সম্পত্তি খরিদ করেন। বলাবাহুল্য, তখনও মুমিনশাহীতে জিলা হয়নি।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের রায়রায়াঁ চাঁদরায়ের পিতা। কথিত আছে, চৌধুরী বাবু একদিন মজনু ফকীর নামে এক দস্যুসর্দারের কাছ থেকে এই মর্মে এক চিঠি পান যে, অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার চাই ; চৌধুরী মশায় যেন এ ব্যাপারে গড়িমসি করেন না। মজনু ফকীরের নামে তখন ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল সারাদেশে। ফলে, চৌধুরী মশায় এমন ভীত হয়ে পড়েন যে, গ্রামবাসীদের সাহায্যে রাতারাতি খাল খনন করে পার্শ্ববর্তী নাগর নদীতে সংযুক্ত করে সেই খালের সাহায্যে রাতারাতি পালিয়ে ময়মনসিংহের জাফরশাহী পরগনাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাফরশাহী পরগনায় কৃষ্ণপুর ও মালঞ্চ নামক স্থানদ্বয়ে এই চৌধুরী পরিবারের বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

কথিত আছে, এর পরেও তাঁরা ফকীরদের দ্বারা অত্যাচারিত হন। ফলে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে ময়মনসিংহ পরগনার গৌরিপুর, রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। সম্প্রতি এই গৌরীপুরের রাজবাড়ীতে 'গৌরীপুর কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য

শ্রীকৃষ্ণ আচার্যও শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সমসাময়িক। ইনিও প্রথমে বগুড়া জিলার টেপা ঝাকেরের বাসিন্দা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মতো ইনিও ময়মনসিংহের আলেপসিং পরগনায় প্রচুর ভূ-সম্পত্তি খরিদ করেন। কথিত আছে যে, সমকালীন ফকীর-সন্ন্যাসীদের অত্যাচারেই তাদেরকে জন্মভূমি ত্যাগ করে মুমিনশাহী জিলার আলেপসিং পরগনার মুক্তাগাছায় বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল। সরকারী পুলিসী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ১৭৮০ ঈসায়ীতে মুক্তাগাছার জমিদারগণ তাঁদের বাসভূমি স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু মুমিনশাহীর জিলা বিবরণী (গেজেটিয়ার) লেখক বলেছেন, "Sri Krishna had four sons who transferred their head quarters from Bogra to Bahadurpur and afterwards to Muktagacha, about 1750."[৩৪]

অর্থাৎ তারা তাদের জমিদারীর প্রধান কেন্দ্র প্রথমে বগুড়া থেকে বাহাদুরপুরে এবং পরে বাহাদুরপুর থেকে মুক্তাগাছায় স্থানান্তরিত করে ১৭৫০ সালে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত ঘটনার অন্তত ত্রিশ বছর আগে তাঁরা বাসভূমি স্থানান্তরিত করেছেন এবং সেই ঘটনা শুধু ফকীর আন্দোলনের আগে নয়, বাংলায় ইংরেজ বিজয়েরও বহুপূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর তাছাড়া রাতারাতি খাল খনন করে বাসভূমি ত্যাগের কাহিনী সম্পর্কে বলা যায় যে, এ শুধু রূপকথাতেই মানায়!

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কাহিনী সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলা যায়। তবে একথা সত্যি, এই জমিদারদের সঙ্গে ফকীর-সন্ন্যাসীদের তেমন সৌহার্দ ছিল না। এমন কি আড়াআড়িও ছিল।

আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, ১৭৯১ সালে কড়াইবাড়ির জমিদারদের সঙ্গে শেরপুরের জমিদারদের মধ্যে এক সীমানা-সংঘর্ষ বাধে ; এই সংঘর্ষে মজনুর দলের হিজরী সর্দারের সাহায্যে শেরপুরের জমিদারী কাচারী লুট করা হয় এবং যথাক্রমে নয়আনী ও সাতআনীর জমিদারদ্বয়কে অপহরণ করে কড়াইবাড়ীর জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়।

এই সময়ে মুমিনশাহীর কালেক্টর ছিলেন মিঃ বেয়ার্ড। বেয়ার্ড সাহেব বহুকষ্টে এই সমস্যার সমাধান করেন। বলাবাহুল্য, কালেক্টর সাহেবের নিজের চেষ্টায় হয়নি, এ ব্যাপার বড়লাট ও তাঁর বোর্ড পর্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রায় তিন'শ সশস্ত্রবাহিনীসহ হিরজী সরদার এই সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে এবং সর্দার নিজে বন্দীও হয়।[৩৫]

৩৪. F.A. Sachse, Bengal District Gazetteer, Mymensing (Calcutta,1917), P. 143
৩৫. Sachse, Ibid, P. 31.

অথচ এই ঘটনার দশ-বারো বছর আগে থেকেই এই জমিদারদের সঙ্গে মজনুর দলের সংঘর্ষ চলে আসছিল। (মুমিনশাহীর) মধুপুরের জঙ্গল ও জামালপুরকে মজনু দুর্গস্বরূপ ব্যবহার করতেন। জামালপুরে যে ফকীর-সন্ন্যাসীদের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল তার প্রমাণ, জামালপুরের নামই ছিল তখন 'সন্ন্যাসীগঞ্জ'। ১৭৮২ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। ঐ বৎসর মিঃ হেনরী লজ জামালপুরের নিকটবর্তী বেগুনবাড়িতে এই দুর্দান্ত দস্যুদলের দমনের নিমিত্ত একটি সেনানিবাস নির্মাণ করে তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আসেন। কিন্তু তথাপি ১৭৮৪ সালের আগে তিনি তেমন কিছুই করে উঠতে পারেন নি।

১৭৮৪ সালের পরে দু'একটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হওয়ার পর মজনু ও তাঁর দল এই জিলা ত্যাগ করে অন্যত্র যান।[৩৬]

১৭৮৬ সালে আবার তাঁরা শেরপুর, আলেপসিং ও মুমিনশাহীতে উৎপাত আরম্ভ করেন। এবার স্যার পেট্রিক বেলফোরের নেতৃত্বে চতুর্থ বাহিনীকে (Fourth Regiment) পাঠানো হয় মিঃ লজের সাহায্যার্থে।

কিন্তু তথাপি এই দুর্দান্ত ফকীরদেরকে দমন করা তো দূরের কথা, তাঁরা শেরপুরের কয়েকজন জমিদারকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেন। কমিশনার ইলিয়টকেও তাদের (লজের) সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। তিনি এই সর্দারদের মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল বাধিয়ে, এমনি কি গায়ের বল-প্রয়োগ করে তাদের ধরবার কৌশল করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। অবশেষে মিঃ রটনের অধীনে মুমিনশাহীতে একটি আলাদা জিলা স্থাপন করে অনেক কষ্টে এই দুর্দান্ত দস্যুদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মিঃ লজের বিবৃতি থেকে জানা যায়, শেষোক্ত সংঘর্ষে মজনুর সহকারীদের মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশ জন নিহত এবং তার দ্বিগুণ আহত হওয়ার পরই তাঁরা স্থানীয় জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এই জঙ্গল এমনি গভীর ছিল এবং তার পথ এমনই দুর্গম ছিল যে, পুলিশ বা সিপাহীর মধ্যে সাধ্য ছিল না যে তার অভ্যন্তরে মজনুর দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এই সংঘর্ষে কোম্পানী পক্ষে হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। মিঃ লজ অবশ্য বলেছেন যে, একজন মাত্র সিপাই নিহত হয় ও চারজন আহত হয়। মনে হয়, মিঃ লজও এই ঘটনার পর বিশেষ ভীত হয়ে পড়েন। কেননা, এই সময়ে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আগামী দুই মাসের জন্য অতিরিক্ত একশ' বরকন্দাজ বা সিপাহীর সাহায্য প্রার্থনা করে পাঠান।[৩৭]

---

৩৬ Sachse, P. 31.
৩৭ Sachse, P. 31.

মজনুর শেষ অভিযানসমূহ

১৭৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার কোম্পানী প্রধান রেভিনিউ কমিটিকে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী ও ফকীরসহ মুমিনশাহী জিলায় মজনুর আগমন সংবাদ জানান। তিনি আরও জানান যে, মিঃ ডে'র নির্দেশে লেফটেন্যান্ট ফিল্ড চতুর্থ রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে মজনুর মুকাবিলা করতে অগ্রসর হয়েছেন।[৩৮]

আঠারোই জানুয়ারি তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবও জানান যে, রঙ্গপুরের বিভিন্ন স্থানে মজনু-বাহিনীর উৎপাত শুরু হয়েছে এবং তারা প্রধানত তিনটি উপদলে বিভক্ত হ'য়ে প্রায় সারা উত্তরবঙ্গ ঘেরাও করেছে। যতদূর জানা যায়, এই দলগুলি যথাক্রমে—কোচবিহারের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের উপকণ্ঠের কাসিমগঞ্জ, রঙ্গপুরের কাজিরহাট ও ঘোড়াঘাট এলাকায় সমবেত হয়েছিল। বৈকুণ্ঠপুরের উপদলের অধিনায়ক ছিলেন মজনুর প্রধান সহকারী মূসা শাহ। উল্লেখ্য যে, ঘোড়াঘাটের উপদলটি প্রধানত হিন্দু সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত। এরা ঘোড়াঘাটের সমগ্র এলাকা জুড়ে ছিল। বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, কোম্পানীর কালেক্টর সাহেবগণ ফকীরদের উৎপাতের কথা যতটা না ভাবছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভাবছিলেন প্রজাদের খাজনা রেয়াতের (মাফের) কথা। ফকীরদের এই অভিযানের সুযোগ নিয়ে প্রজারা যে পৌষমাসের কিস্তী খাজনা দেওয়ায় গাফ্‌লতি করবে, এ-ভাবনা তাঁদেরকে বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ-সময় উত্তরবঙ্গে খাদ্য-শস্য, তামাক, চাল ইত্যাদি তিন-চার মণ টাকায় বিক্রি হত। দুই টাকা দিলে আবার এক টুঙ্গি (Tongee) ওজনের খাদ্য-শস্য মিলত।

সে যা-ই হোক, ২৬শে জানুয়ারি রেভিনিউ কমিটির নির্দেশে রঙ্গপুরে একদল কোম্পানীর সৈন্য পাঠানো হয় এবং স্থানীয়ভাবে এক বিরাট বরকন্দাজ বাহিনীও গঠিত হয়। কলকাতা থেকে এনসাইন ডানকান্‌সকে আবার পাঠানো হয় এই বরকন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করতে।

১১ই জানয়ারি তারিখে ডানকান্‌সের একটি বিবৃতি থেকে জানা যায়, প্রায় আটশ' ফকীরের একটি দল ৮ ও ৯ই তারিখে ব্যাপকভাবে জন-সাধারণের অর্থ-সম্পদ লুট করেছে এবং তারও আগে প্রায় পাঁচশ' ফকীরের একটি দল জলপাইগুড়ির 'বোদা' এলাকা আক্রমণ করেছিল।

---

৩৮. Ghose, P. 93.

এই সাংবাদ পাওয়ার পর মিঃ আলেকজান্ডারকে বোদা এলাকার ফকীরদের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। এই সময়ে বোদায় ফকীর-বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন ফকীর নেতা মুসা শাহ।

১৬ই ফেব্রুয়ারিতে মিঃ ডানকান্‌স জানান যে, ফকীররা ইতিমধ্যেই নেপালের গুর্খা রাজার সীমানায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়ে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি বড় রকমের সংঘর্ষ বাধে বগুড়া জিলার চাপাপুকুরের কাছে। পরে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে দিনাজপুরের গিলাবাড়ী এলাকায় মজনুর দলের আগমন কাহিনী জানা যায়। গিলাবাড়ীর প্রজাদের পক্ষ থেকে কেউ দিনাজপুরের কালেক্টরের কাছে এই সংবাদ জানান। কালেক্টর সাহেব লেফটেন্যান্ট এইন্‌সলি (Ainsle) সাহেবকে ঘটনাস্থলে পাঠান (২রা আগস্ট, ১৭৮৬)।[৩৯]

মজনুর দল এইবার মোটা রকমের অর্থ-সম্পদ আদায় করতে সমর্থ হয় এবং মিঃ এইন্‌সলি অনেক কষ্টে মজনুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হন।

বগুড়ার শেলবর্ষের নিকটবর্তী এলাকায় মজনুর দলের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট এইন্‌সলির সৈন্যদলের প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপী ভয়ানক যুদ্ধ চলে এবং শেষ পর্যন্ত মজনুর দল পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।

এই যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট সাহেব ও তার বাহিনী খুব দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে তার একটি পত্র থেকে জানা যায়। মিঃ এইন্‌সলি এ খবর সহকারী (শেলবর্ষে অবস্থানকারী) লেফটেন্যান্ট ব্রেনানকেও জানিয়েছিলেন। মিঃ ব্রেনানও জানান যে, এই সময়ে মজনুর দলে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার লোক ছিল। তারা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল।

এর অল্প কিছুদিন পরে মূসা শাহের নেতৃত্বে বিজানগর পরগনার তেলুন (Tellun) নামক এলাকায় একদল ফকীর সমবেত হয়। দিনাজপুরের কালেক্টরের নির্দেশে মিঃ এইস, এম, দ্য এস্ত্রে (D' Esterre) নিকটবর্তী বিরল (Brool) এলাকা থেকে মুসা শাহের মুকাবিলা করতে অগ্রসর হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মুসা শাহের অনুসরণ করেন। কিন্তু মুসা শাহ্ তখন জগন্নাথপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে যান। মিঃ এস্ত্রের উপর শুধুমাত্র দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকা অবধি মুসা শাহের অনুসরণের নির্দেশ ছিল, তার বেশি নয়। তাই তিনিও আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি।

৩৯. Ghose, P. 95.

মজনুর সর্বশেষ অভিযান

যতদূর জানা যায়, এই বছরের অক্টোবর মাসেই মজনুর শেষ অভিযান পরিচালিত হয়। ২৮শে অক্টোরর তারিখে রঙ্গপুর জিলার কালেক্টর সাহেব পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহের কালেক্টরগণকে মজনুর আগমন সংবাদ জানিয়ে সকলকে সাবধান করে দেন। মজনু শাহ (Mudgenoo Saw) তখন কোল্লাল (Coltal) নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। কোল্লাল থেকে তিনি সদলবলে এপ্পলি পরগনার দিকে অগ্রসর হন।

লেফটেন্যান্ট ব্রেনানকে মজনুর বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। ব্রেনান মাত্র ৫৯ জন সিপাহীসহ এই দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন। বগুড়া জিলার নিকটবর্তী কালেশ্বর নামক স্থানে তারা মজনু বাহিনীর সাক্ষাৎ পান। কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হয় ; যুদ্ধে মজনুর দল পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।

বগুড়ার কালেক্টর লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের সৈন্য পরিচালনা ও সাহসিকতার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। বস্তুত এই দুঃসাহসী লেফটেন্যান্ট ফকীর আন্দোলন দমনের ব্যাপারে যেমন বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তেমন আর কেউ দিতে পারেন নি। এমন কি, তাঁর মতো এতদূর কৃতকার্যও হতে পারেন নি আর কেউ। উল্লেখ্য যে এই ক্যাপ্টেন ব্রেনানের হাতেই মজনুর অন্যতম সহযোগী ভবানী পাঠক (দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের) বা ভবানন্দের (আনন্দ মঠের) পতন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত 'দেবী চৌধুরাণী' নামটিও প্রথম এই লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত হয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের একটি বিবৃতি থেকেই জানা যায়, এই যুদ্ধে মজনুবাহিনী চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় (৮ই ডিসেম্বরের বিবৃতি)। কালেশ্বরের নিকটবর্তী একটি নালার পারে মজনু তার কয়েকজন নিহত অনুচরকে সমাহিত করেন এবং পাঁচজন প্রধান অনুচরের আহত দেহ বহুকষ্টে ডুলি সহযোগে স্থানান্তরিত করেন ও পরে যমুনা নদী দিয়ে ফেরীর সাহায্যে কোন গোপন স্থানে নিয়ে যান।

অনুমতি হয়, এরপর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে মজনু দেশে চলে যান, আর কোন দিন তাঁকে বাংলাদেশের কোথাও দেখা যায়নি। আনুমানিক ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে কানপুর জিলার মাখনপুর এলাকায় তাঁর ওফাত হয় বলে সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়। তাই কালেশ্বরের এই অভিযানকেই মজনুর সর্বশেষ বাংলা অভিযান নামে অভিহিত করা যায়।

ইংরেজ কোম্পানীর মজনু-ভীতি

কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মজনু-ভীতি যে কিরূপ প্রবল ছিল এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করেও যে তাঁরা তাঁর আন্দোলন দমন করতে কিরূপ বিপুলভাবে ব্যর্থ হয়েছেন 'রেভিনিউ' কমিটি থেকে প্রচারিত নিম্নলিখিত ইংরেজি বিবৃতিটি থেকে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলছে। বলাবাহুল্য, এতে মজনুর বীরত্ব, তাঁর সাংগঠনিক নৈপুণ্য ও দূরদর্শিতার আত্যন্তিক প্রশংসা করা হয়েছে। যথা ঃ

"Although Majinoo has been overtaken and attacked with success in some former occasions, it has been found difficult in general to punish him for his depredations. The Zaminders are apprehensive of giving information respecting his motions and his followers are taught to disperse when pressed and unite again at appointed stations, it seldom happens that they can be apprehended."[৪০]

মানে ইতিপূর্বে যদিও একাধিকবার তাঁকে পরাজিত ও প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার লুটতরাজের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া বেশ শক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। জমিদারগণ তাঁর সন্ধান জানাবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ; কিন্তু তাঁর অনুসারিগণ এমনই ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে তাদের অনুসরণ করতে গেলেই দেখা যায়, তারা নেই, কোথায় সরে পড়েছে; আবার নির্দিষ্ট স্থানে তারা অকস্মাৎ এসে একত্রিত হয়। এমন ব্যাপার কচিতই মেলে যে তাদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্বয়ং লর্ড হেস্টিংসও তাদের এই অলৌকিক কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

সমকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যত রকমের ব্যবস্থাই অবলম্বন করুক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন।

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস তাই অবাক হয়ে ভেবেছেন, তারা কোন বেহেশ্তী অতিথি বুঝি! দেশবাসীদের উপর তারা জুলুম করে, অনেক সময় তাদের ছেলেমেয়েও নাকি চুরি করে ; কিন্তু দেশবাসীরা তথাপি কেন যেন তাদেরকে ভালবাসে এবং সে জন্যেই নাকি তাদেরকে ধরিয়ে দিতে চায় না !

---

৪০. Ghose, P. 91.

॥ বারো ॥

মজনুর উত্তরাধিকারিগণ

''The successors of Majnu Shah were Musa Shah, said to be his brother or cousin, Cherag Ali Shah, his son, Pharagul Shah, Subhan Shah. Madar Bux,. Jory Shah, Karim Shah and others—all claiming to be his followers. So great indeed was the terror of Majnu's name that any other Fakir claiming to be his follower was sure tp strike terror in the country and could levy contribution unopposed." —J. M. Ghose.

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মজনুর উত্তরাধিকারী ফকীরদের মধ্যে কোন হিন্দু-সন্ন্যাসীর নাম নেই, এমন কি ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকেও তাঁর উত্তরাধিকারী বলা হয়নি। কারণ, আচার-আচরণ, ভক্তি-বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলমান ফকীরে পার্থক্য সুস্পষ্ট। অথচ সরকারী বিবৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান সন্ন্যাসীকে এক করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে--তাঁদের শুধু 'সন্ন্যাসী' অথবা 'ফকীর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেন এঁরা উভয়েই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু আসলে যে তা হতে পারে না, তার প্রমাণ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়েছেন ; তিনি 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' সঙ্গে ফকীর বিদ্রোহকে চড়াতে চান নি—যদিও এঁরা একত্র আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

সন্ন্যাসী ও ফকীরদের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা যে একত্র হতে পেরেছেন তার কারণ উভয়ের নীতিগত ঐক্য ছিল এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছিল জাতক্রোধ।

কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসী ও ফকীরকে সাধারণ শত্রু যেমন মনে করতেন, সন্ন্যাসী ফকীরেরাও তেমনি কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে সাধারণ শত্রু মনে করতেন।

বলা হয়েছে, ১৭৭২ সালে মজনু শাহ্ যেমন নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে অন্যায়ভাবে ফকীর হত্যার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিলেন, নেপালের রাজাও তেমনি ফকীর-সন্ন্যাসীদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করা ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে অন্য কোন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, যদিও তিনি এই ধরনের একটি চুক্তিনামাতে স্বাক্ষরও করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, নেপালরাজ এই মর্মে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, ফকীর সন্ন্যাসীদের যতই দোষ থাক না কেন, বিনা কারণে তাঁদের প্রাণদণ্ড দেওয়া বা কোনরূপ অত্যাচার করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্মও বটে।[৪১]

পক্ষান্তরে, ফকীরগণও এ কথা নাকি বুঝতে অপরাগ ছিলেন যে, তাঁদের কাজে ইংরেজ সরকারই বা বাধা দেওয়ার কে ? এর সহজ অর্থ এই যে, ইংরেজ কোম্পানীকে তাঁরা কিছুতেই এ দেশের বৈধ মালিক বলে স্বীকার করতে পারেন নি।

৪১ Ghose, P. 2.

মুসা শাহ্

মজনুর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত বলতে গেলে মুসা শাহ্‌কেই বলতে হয়। সরকারী বিবৃতিতে মুসা শাহ্‌কে মজনুর ভাই অথবা জ্ঞাতি ভাই বলা হয়েছে। আবার কখনও বা তাঁর ভৃত্যও বলা হয়েছে।

মজনুর ওফাতের পর (১৮৭৭ ঈ.) মুসা শাহ্ প্রমুখরা শতাব্দীর শেষ অবধি এই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথমদিকের প্রায় ছয় বছর ধরে মুসা শাহ্-ই ফকীর আন্দোলনের সর্বসম্মত নেতা ছিলেন। সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায়, ১৭৯২ সালের মার্চ মাসে মজনুর পুত্র পরাগ আলীর (Peraugally) সঙ্গে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হন।[৪২]

ফকীর সম্প্রদায়ে মুসা শাহের কিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, এবং ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিরূপ ভীতির চোখে দেখত নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মিলছে।

১৭৮৭ সালের জুলাই-এর ঘটনা। তখন মজনু শাহের ওফাত হয়েছে। ফকীর দলের নেতা হয়েছেন মুসা শাহ্।

মুর্শিদাবাদ জিলার মসীদা পরগনার নায়েবের কাছ থেকে কালেক্টর সাহেব একখানি দরখাস্ত পেলেন, তাতে লেখা আছে—"পাণ্ডুয়া জিলার বাইশহাযারী পরগনাস্থিত সরহট্টা গ্রামে মুসা শাহ্ ফকীর প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) লোকসহ জমায়েৎবস্তু হয়েছে। সে অনবরত দরখাস্তকারীর জমিদারীর (মসীদা পরগনার) নায়েবকে একটা সমঝোতায় আসতে বলছে। গ্রামে লোককে মারধর করে সে টাকা আদায় করে ; পরগনার গোমস্তা ও গ্রামের প্রধানদের ডেকে এনেও অপমান করে ; ফলে প্রজাগণ এবং গ্রামবাসিগণ গ্রাম থেকে পালিয়েছে এবং চাষবাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে।"[৪৩]

ঘটনা অবগত হয়ে কালেক্টর সাহেব অবিলম্বে মোহনসিংহ ও দর্পসিংহ নামে দুইজন হরকরাকে সেখানে জমিদারদের সহায়তায় শান্তি রক্ষার জন্য পাঠান ; এবং সম্ভব হলে ফকীরদেরকে ধরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন। সমস্যার সমাধান কিন্তু তাই বলে এত সহজে হয় না। ফকীরের হাতে 'দস্তক' বা হুকুমনামা দিতেই

৪২. "In a letter, dated the 4th April to Lord Cornwallis. Mr. Harrington wrote that "Shaw Moosa was killed in the beginning of the past month in a Skirmish with Peraugally." —Ghose. P. 100.

৪৩. ঘোষ, পৃ. ৯৮।

ফকীর অগ্নিশর্মা হয়ে হুকুমনামা কেড়ে নেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে মসীদা পরগনার নায়েব দুলাল চৌধুরীকে এই মর্মে এক চিঠি লিখেন। "শুনলাম আপনি মুর্শিদাবাদের কাছারীতে আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন ; সেখান থেকে হরকরা পাঠানো হয়েছে। এই নালিশ আর হরকরা দিয়ে কোন ফল হবে না। আমি যে টাকা চেয়েছি তা আমাকে দিতেই হবে এবং নিশ্চয়ই আমাকে তা আদায় করতে হবে। আপনি যাঁর কাছে নালিশ করেছেন তাঁকেও আমি এ কথা বলে দিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই হরকরার নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন নন।"

মিঃ ডাউসন, মুর্শিদাবাদের কালেক্টর, এ সংবাদ শুনে প্রমাদ গনেন। তিনি এখন কি করবেন! মুসা শাহের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা তাঁর জানা ছিল। অগত্যা তিনি ১২ই জুলাই তারিখে রেভিনিউ বোর্ডের কাছে মসীদা পরগনার আসন্ন বিপদের কথা জানান। এই সঙ্গে এ-কথাও জানাতে ভুলেন না যে, মুসা শাহ্ প্রায় পাঁচশ' সশস্ত্রবাহিনীসহ উপস্থিত হয়েছেন ; এই সেনাবাহিনীর অনেকেই প্রাক্তন সৈন্য বিভাগের কর্মচারী এবং তারা ইংরেজ বাহিনীর মতোই সুসজ্জিত। এ-সংবাদে রেভিনিউ বোর্ডও বিশেষ প্রমাদ গনেন। তাঁরা মিঃ ডাউসনের পরামর্শ অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পুর্নিয়া এবং ভাগলপুর জিলাসমূহের কালেক্টরগণকে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় একত্রে এ-বিষয়ের মুকাবিলা করবার নির্দেশ দেন ; এবং এ-কথাও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি এই যৌথ ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় তবে বোর্ড তাঁদের সাহায্যার্থে নিয়মিত বাহিনী পাঠাবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছেন। অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকরী করার চেষ্টা চলে। মিঃ ডাউসন দিনাজপুরের কালেক্টরের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠান। অবশ্য তার আর প্রয়োজন হয় না ; মুসা শাহ্ ইতিমধ্যেই দিনাজপুরের পথে অগ্রসর হন। ১৭ই আগস্ট তারিখে দিনাজপুরের কালেক্টর বোর্ডকে জানান যে, মুসা শাহ্ 'এপ্পলি' (Appole) পরগনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ে ফকীরদের দৌরাত্ম্য এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ফকীরদের অনুসরণ করা আর যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছিল না। তাই কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন যে, ফকীরদের শক্তি-সামর্থ্যের দিকে বিবেচনা না করে অযথা যেন আর তাদেরকে আক্রমণ করা না হয়।

মিঃ হ্যাচের (দিনাজপুরের সাহেব কালেক্টর) কিন্তু এই নির্দেশ পছন্দ হয়নি ; তিনি সাহেব জাতির স্বভাবসুলভ অহংকারের দ্বারা চালিত হয়ে সামান্য সংখ্যক সিপাহী এক জমাদারের অধীনে মুসা শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই সিপাহী দল যখন পরাজিত হয়ে আসে, মিঃ হ্যাচের তখন আর ক্রোধের সীমা রইল না ; তিনি অবিলম্বে মুসা শাহের এই ব্যবসা চিরতরে খতম করবার অভিপ্রায়ে তাজপুরের কম্যান্ডিং অফিসারকে মুসা শাহের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, তিনি

অফিসারকে এমন নির্দেশও পাঠান যে ধৃত হলে ফকীরদের প্রতি দশজনের একজনকে যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয়। এবং বাকিগুলিকে যেন স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য সোর্পদ করা হয়। মিঃ হ্যাচ মুসা শাহের ব্যাপারেও একই রূপ নির্দেশ দিয়ে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতির জন্য পাঠান। বোর্ড অবশ্য কালেক্টর সাহেবের সবগুলি অনুরোধই রক্ষা করেছিলেন ; শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত বিচার করে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ অনুমোদন করেন নি।

সে যা-ই হোক, মিঃ হ্যাচের চেষ্টায় এবার মুসা শাহ্ কোম্পনীর সীমানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। মুসা শাহ্ কোম্পানীর সীমা ত্যাগ করে গেলেও রঙ্গপুরের কালেক্টর নেপালের রাজাকে মুসা শাহের দলকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। ইতিমধ্যে বোর্ডও দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, পুর্ণিয়া ও রাঙ্গামাটির কালেক্টরগণকে রঙ্গপুরের কালেক্টরের অনুকূলে কাজ করবার নির্দেশ দেন।

গুর্খা রাজা কোম্পানীর অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে জানান। ফলে মুসা শাহ্কে আবার সদলবলে ফিরে আসতে হয়।

মুসা শাহ্ রাজশাহীর দিকে পুনরায় ফিরে এলেন। রাজশাহী জিলার কালেক্টরের প্রতি দিনাজপুরের কালেক্টরের লেখা একখানি চিঠি থেকে জানা যায়, মুসা শাহের অনুসারীদের সঙ্গে মহারাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর একটি খণ্ড যুদ্ধ ঘটে (২০শে মার্চ, ১৭৮৮ ঈ.)। যুদ্ধটি সংঘটিত হয় 'পউল্লা' (Paulla) নামক স্থানে। স্থানটি জিয়াসিং পরগনার অর্জুন পুকুরের নিকটবর্তী। বরকন্দাজদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয় এবং তাদের কয়েকজনকে বন্দী করেও নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকালে স্থানীয় কয়েকটি গ্রামে লুটপাট করা হয়। ১০ই চৈত্র অর্থাৎ ২০শে মার্চ একজন জমাদারের অধীনে ত্রিশজন সৈন্যের একটি দল লুণ্ঠনকারীদেরকে তাড়িয়ে দেয়। এবং কৌতূহলের ব্যাপার, স্থানীয় জনসাধারণ এবারও নিষ্ক্রিয় দর্শকের স্থান গ্রহণ করেছিল। জমাদার ও গোয়েন্দা বিভাগের বর্ণনা মতে, পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন জমাদারদের বা সেনাবাহিনীকে কোন রূপ সাহায্যও করেনি এবং লুটেরাদেরকে বাধাও দেয়নি। এই ঘটনা ঘটে জিয়াসিং পরগনাস্থিত নিয়ামতপুরে। মুসা শাহ্ ও তার অনুসারিগণ শেলবর্ষের দিকে চলে যায়। সেখানে তারা বেশ কিছুদিন অবস্থান করে। কেননা, ২২শে জুন তারিখে দিনাজপুরের কালেক্টর মুর্শিদাবাদের কালেক্টর সাহেবের কাছে লিখেছেন, মুসা শাহ্ ও তাঁর অনুসারিগণ জাহাঙ্গীরপুর পরগনার জাহাঙ্গীরপুর ও চামপুর (Chumpore) নামক গ্রাম দুটিতে অবস্থানকালে লেফটেন্যান্ট খ্রীস্টী তাদের আক্রমণ করেন। গ্রামবাসীরা মুসা শাহের পালাবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। লেফটেন্যান্ট সাহেব লিখেছেন, মুসা শাহকে বন্দী করা সম্ভব হত যদি গ্রামাবাসীরা একটু সাহায্য করত।

অর্জুন পুকুরের ঘটনায় গ্রামবাসীদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এমন বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তাদের প্রতি পাইকারী জরিমানা করারও হুকুম দিয়েছিলেন কালেক্টর সাহেব। আর শেষোক্ত ঘটনা সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট সাহেব যে মন্তব্য করেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The alertness of the villagers to seize upon what did not belong to them manifestly shows that mere timidity is not solely the cause of their flying or remaining inactive, as is their custom upon these occasions."

অর্থাৎ উক্ত সংঘর্ষগুলিতে লুটতরাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তাদের স্বভাবগত ভীরুতাই তাদের নিষ্ক্রিয়তা বা তাদের পলায়নের একমাত্র কারণ নয়। উপরন্তু এইসব ঘটনা থেকে এরূপ প্রতীতিই জন্মে যে দেশবাসীরা ফকীরদের সক্রিয় সমর্থক ছিল।

পরাগ আলী-চেরাগ আলী

প্রকৃত প্রস্তাবে মুসা শাহের ওফাতের পরে এই সম্প্রদায়ের কোন সর্বসম্মত নেতা ছিলেন না। কখনও পরাগ আলী, কখনও চেরাগ আলী, কখনও বা করীম বক্স, কখনও বা রওশন আলী, কখনও সোবহান শাহ্ এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে এ কথা সত্য যে, মজনু শাহ্—মুসা শাহের আমলে এ সম্প্রদায়ের যে একটা বিশেষ মর্যাদা জন-সমাজে ছিল, তাতে ভাটা পড়েছিল ; তথাপি ফকীর সম্প্রদায়ের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুদিন অবধি অব্যাহত ছিল।

বলা হয়েছে যে, পরাগ আলী ছিলেন বিখ্যাত মজনু শাহের পুত্র (Natural son)। চেরাগ আলী ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র (Adopted son)।

১২০১ সালের ১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই, ১৭৯৪ ঈ.) তারিখে লিখিত বসন্ত লাল আমীনের একটি বিবৃতি থেকে জানা যায়, এই সময়ে রঙ্গপুর জিলার কাউনিয়াতে (Kwaliah) চেরাগ আলী ও সোবহান শাহের ছাউনী (Chowny) বা আস্তানা ছিল। বসন্ত লাল এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"চেরাগ আলী হলেন মজনু শাহের চেলা এবং যহুরী শাহ (Jory Shah) চেরাগ আলীর ভাতিজা। উভয়েই মাদারী খানদানের অনুসারী ফকীর।"

মুসা শাহের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে--"মুসা শাহ্ (Moosy Shah) ছিলেন মজনুর (Madjons) ভৃত্য।"

বসন্ত লাল আরও বলেছেন, মজনু শাহ্ ও মুসা শাহের ওফাতের পর চেরাগ আলী ও সোবহান শাহ্ কাউনিয়াতেই (Kowlia) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১৭৯৩ সালে মুরং-এর জনৈক আবাসিক সরকারী কর্মচারী চেরাগ আলী ও সোবহান আলী শাহ্ সাহেবদ্বয়ের ছাউনি পরিদর্শন করেন। এ সম্পর্কে ১৭৯৫ সালে পুর্ণিয়ার কালেক্টর মিঃ বার্জেস-এর নিকট তিনি যে বিবৃতি দেন তা নিম্নরূপ ঃ

"প্রায় দু-বছর আগে আমি মুরং-এ থাকাকালে কাউনিয়াতে চেরাগ আলীর ছাউনীর পাশে তাঁবু করেছিলাম। চেরাগ আলী তাঁর প্রায় চার'শ শিষ্যসহ বেরিয়ে এলেন। তাদের পরনে ছিল সন্ন্যাসীদের মতো আধাকমলা রঙের এবং বাকী আধা নীল রঙের জ্যাকেট। তাঁদের চেহারা-ছবি বেশ ভালোই বোধ হল; প্লাটুন ফায়ারিং-এ তারা আমার কল্পনাতীত ভালো করল এবং চমৎকার অস্ত্র-খেলা দেখালো। একটু পরে যেই আমি সোবহান আলীর ছাউনির নিকট হাজির হয়েছি, একজন ঘোড়-সওয়ার বেরিয়ে এসে অত্যন্ত উদ্ধতভাবে আমার কাছে এসে কি যেন বলল। আমি তাকে বললাম যে,

আমি তার প্রভুর বিষয়ে আর কিছু বলব না, তবে আমি তার এই ব্যবহারের কথা 'সুবা'কে জানাব এবং সে তার ফল নিশ্চয়ই ভোগ করবে। এই কথা শোনা মাত্র সে তার ঘোড়ায় চড়ে এক লাফে পার্শ্বস্থ্ নালাটি পার হয়ে তার নিজের দলে গিয়ে মিশল। অল্পক্ষণ পরে ছ'জন ঘোড়-সওয়ার এসে আমার গতি রোধ করে দাঁড়ালো" এবং সেই লোকটিকে আমার কাছে মাফ চাইতে বাধ্য করল।[৪৪] কেননা, 'সুবা'র কাছে এ সংবাদ গেলে তাদের বিপদের আশংকা আছে, এ কথা তারা ভালো করেই জানে।

চেরাগ আলী শাহের মৃত্যু সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৭৯৪ সালের আগস্ট মাসে মতি সিংহ বা মতিগিরির এক অতর্কিত আক্রমণের ফলে তিনি নিহত হন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মতিগিরির কাছে চেরাগ আলীর কিছু দেনা ছিল। যথাসময়ে সে দেনা পরিশোধ করা হয়নি। একদিন এই দেনা-পাওনা নিয়ে দু-জনের মধ্যে বেশ মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় ; পরিণামে মতিগিরির হাতে তিনি নিহত হন। কথিত আছে যে, মতিগিরি কতিপয় অনুচরসহ একদিন রাতে অতর্কিতে চেরাগ আলীকে আক্রমণ করে হত্যা করে। তখন চেরাগ আলী 'রাঙ্গেলী' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন।

কোম্পানীর আদালতে মতিগিরির বিচার হয়। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এভাবে দু'জন স্বাধীন লুটেরার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নাকি বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ভাষায় ঃ

"The country was relieved of two free booters."[৪৫]

পরাগ আলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারা যায় না। শুধু জানা যায়, দিনাজপুর জিলার পোরশা (বর্তমানে রাজশাহীতে) নামক স্থানে তাঁর অনুসারিদের সঙ্গে কোম্পানী কর্মচারীদের এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর বরকতুল্লাহ্ হরকরাকে এ বিষয়ে খোঁজ-খবর করবার জন্য পাঠানো হয়।

বরকতুল্লাহ প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায়, দলের নেতা পরাগ আলী অসুস্থ অবস্থায় কিনু দেওয়ান নামক তার এক মুরীদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। দেওয়ান তাকে সিপাহীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। হরকরার জবানবন্দীর পর কিনু দেওয়ানকে মুর্শিদাবাদ কোর্টে তলব করা হয় এবং দিনাজপুরের কালেক্টর সাহেবকে এতদসংক্রান্ত সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করে পাঠাতে বলা হয়।[৪৬]

---

৪৪. ঘোষ, পৃ. ১১৩।
৪৫. ঘোষ, পৃ. ১২৬।
৪৬. ঘোষ, পৃ. ১০২-১০৩।

করীম শাহ্

মজনুর আর একজন অনুসারীর নাম করীম শাহ। ১৭৯৫ সালে পুর্ণিয়ায় কালেক্টরের নিকট থেকে রেভিনিউ বোর্ড ও তার প্রেসিডেন্টের কাছে নিম্নলিখিত সংবাদটি পৌছে।

"করীম শাহ্ নামে একজন ফকীর নেতা পঞ্চাশ জন ঘোড়-সওয়ার ও প্রায় তিনশ' বরকন্দাজসহ্ এখানে এসে পৌছেছেন। তাঁরা পশ্চিম দিক থেকে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে সামরিক চিহ্ন যুক্ত পতাকাদি, কয়েকজন উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহী লোকজনও আছে। প্রতিদিনই তার দলের লোকসংখ্যা বাড়ছে। প্রতি-পদাতিকের জন্য তিনি পাঁচ টাকা করে মাসিক মাহিয়ানা দেন এবং ঘোড়-সওয়ারের বাবদ পনেরো টাকা। এরা ফরকিয়া, বালিয়া ইত্যাদি পরগনার লোক। ফকীর সাহেব তাদের এক মাসের বেতন আগাম দিয়ে থাকেন এবং তিনি যে গ্রামের মধ্য দিয়ে যান গ্রামবাসীরা গ্রাম প্রতি তাকে এক টাকা করে সালামী দিয়ে থাকে।"

সোবহান শাহ্ ও পরবর্তী ফকীরগণ

সোবহান শাহের কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তী ফকীরগণের মধ্যে করীম শাহ্ ও সোবহান শাহের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে কোম্পানীর সীমানা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও নেপাল-এলাকায় বসবাসকালে তাদের দৈনন্দিন জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে এ-কথা অন্তত প্রমাণিত হয় যে, দস্যু-তস্কর নামে পরিচিত হলেও দেশবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁরা আদায় করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, মালদহের পাচলি জঙ্গলে তার একটি অস্ত্রাগার (Magazine) ছিল। রঙ্গপুর জিলার কাউনিয়াতে সোবহান শাহের একটি ছাউনি ছিল, এ কথাও বলা হয়েছে।

কথিত আছে, পরবর্তী ফকীরগণ নেপাল রাজের এলাকাভুক্ত নেপাল তেরাই নামক স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। এঁদের সম্পর্কে সংগৃহীত বসন্ত লাল আমীনের তথ্যাদি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যায়--রাঙ্গেলীতে গুর্খা রাজার একটি কাছারী আছে। কাছারীর অদূরেই চেরাগ আলী শাহের ছাউনি। চেরাগ আলীর পরিচয় স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তিনি মজনু শাহের চেলা (Chela of Modjon's Saw)। জোরী (Jory) শাহ নামে চেরাগ আলীর এক ভাইপো আছে। এঁরা মাদারী ফকীর নামে পরিচিত। রাঙ্গেলী থেকে তিন মাইল দূরে 'কাউনিয়া' নামক স্থানেও একটি কাছারী আছে।

কাউনিয়াতে সোবহান শাহ্ ও শমশির শাহ্ সাহেবদ্বয়ের ছাউনি আছে। এঁরা মুসা শাহের (Moosy Saw) চেলা। গোবিন্দ গিরি নামে আর একজনের উক্তি থেকে জানা যায়, সোবহান শাহ ও শমশির শাহ পরস্পর সম্পর্কে আপন ভাই।[৪৭]

সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায়, চেরাগ আলী ও রওশন আলী একত্রে একটি ফার্ম করেছিলেন। একটি সিলও তারা তৈরি করেছিলেন, তাতে 'চেরাগ-রওশন আলী' নামও খোদিত হয়েছিল।

সরকার পক্ষের ধারণা, এই ফার্ম আসলে এজমালীতে ডাকাতি ব্যবসায় চালানোর উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

---

৪৭. Ghose. P. 111 ; "Cherag Ali the adopted son of the late Majnu Shah (Mejenoo Saw) and he and Roushan Ali are said to have established a sort of partnership in plunder under the firm of Cherag-Roushan Ali the name which name which is cut on their seals." Ibid .P. 105.

॥ তেরো ॥

নেপাল-রাজের আশ্রয়ে ফকীরনেতাগণ

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ও স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় ফকীর বিপ্লবী দলকে কোম্পানীর অধিকৃত এলাকা থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হলেও চিরস্বাধীন ফকীর-নেতাগণ তাদের কর্তব্য কর্ম বিস্মৃত হন নি। নেপালে আশ্রিত হিসেবে বসবাস কালেও তাঁরা নতুন শিষ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাদেরকে যুদ্ধ-বিদ্যাতেও পারদর্শী করে তুলেছেন। পূর্বাধ্যায়ে করীম শাহ ও সোবহান শাহের ছাউনি সংক্রান্ত বিবৃতি থেকেও এরূপ অনুমান করা যায় সহজেই।

বলা বাহুল্য, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ও নেপালে অবস্থিত এই ফকীর নেতাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তারা তাই অবিলম্বে করীম শাহ ও সোবহান শাহকে বন্দী করে প্রত্যর্পণের জন্য নেপাল রাজকে অনুরোধ করে পাঠান। কিন্তু নেপাল-রাজ বা তাঁর সুবা কোম্পানীর এই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে রাযী হন নি। অবশ্য তাঁরা আশ্রিতকে বিপদাপন্ন করতে যেমন রাজী হননি, তেমনি প্রতিবেশী ইংরেজ কোম্পানীকে বেজার করতেও চান নি। তাই তাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদেরকে নেপালরাজের রাজ্যের সীমানা ত্যাগের অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে সমকালীন পুর্ণিয়ার কালেক্টর মিঃ বর্জেস মুরংস্থিত নেপালী সুবার উকীল দেও সিং উপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত দু'খানি কৌতূহলজনক গোপন পত্র উদ্ধার করেন।[৪৮] সুধী-সমাজের কৌতূহল নিবারণার্থে পত্র-দু'খানির বাংলা তরজমা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পত্র দু'খানি শ্রী করীম শাহ্জী ও শ্রী সোবহানী শাহ্জীকে লিখিত।

১ নং চিঠি

পেয়ারে দোস্ত শ্রী করীম শাহ্জী বরাবর—

দেও সিং উপাধ্যায় উকীল আপনাকে সালাম পাঠাচ্ছে। আমি ভালো আছি ; রোজই আপনার সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। বড় সাহেব (কালেক্টর সাহেব) আমাকে নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ 'করীম শাহ্কে বন্দী করে

৪৮. ঘোষ, পৃ. ১২৬-১২৭। Vide Judicial (Criminal), Original Consultation, No 4. dated 24th October, 1798.

পাঠিয়ে দাও।' উভয় পক্ষে বড় কঠোর উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়েছে। অবশেষে ভদ্রলোক আশা করেছেন যে, আমি যদি করীম শাহকে ধরে না দিই, তবে তাঁরা তাঁকে ধরবার জন্য সৈন্য পাঠাবেন। "অতএব আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, মিঃ স্মীথ গোলাগুলি সংগ্রহ করেছেন, ভোপলার কাছে সিপাহীর জন্য লোক পাঠিয়েছেন। তাই আপনি সাবধান হোন। মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করুন ; তিনি যদি আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনি যদি নিজকে তাঁর সমকক্ষ মনে করেন, যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন। এখানে আমি জন-সংযোগের চেষ্টা করি।

অবশ্য যদি পেট-পালাই আপনার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলে অন্য কোন দেশে গমন করুন। এখানকার লোকেরা আত্মশক্তির বলে (Dhak) চলে না বরং পরের নামের পরে (Hank) চলে। মহারাজের প্রজাদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে ; কেননা, নিশ্চয়ই সৈন্যদল এখানে হানা দেবে।"

২ নং চিঠি

পেয়ারে দোস্ত শ্রী সোবহানী শাহ্জী বরাবর—

দেও সিং উপাধ্যায় লিখছে ; সালাম আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ভদ্রলোক (ব্রিটিশ অফিসার) এখানে আমাকে অত্যন্ত কড়া কথা বলেছেন, "তোমার রাজ্যে সকল ফকীর থাকে এবং আমাদের জিলায় লুটপাট করে ; অতএব ফকীরদের ধরে আমাদের হাতে দিয়ে দাও।" আমি জবাব দিলাম ফকীরেরা আমার রাজ্যে বাস করে, তারা ভিক্ষে করে খায়, তাদের ধরে দিয়ে আমাদের বা আমার কি লাভ ? ভদ্রলোক বললেন, "আমি তাদের ধরবার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছি যেখানে তাদেরকে পাওয়া যায় ধরে আনা হবে। যদি তোমাদের যুদ্ধের সাধ থাকে তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসো, যদি না থাকে এবং উদরপূর্তিই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে অন্য কোথায়ও গিয়ে তার সেবা কর। অন্যথায় মহারাজের প্রজাগণের দুঃখের সীমা থাকবে না। ভদ্দলোক নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন।"

এ থেকে নেপালরাজ ও ফকীরদের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব এবং সেই সঙ্গে নেপালী মহারাজা ও তাঁর জনগণের মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে। বলা-বাহুল্য, পত্র-লেখককে কালেক্টর সাহেব বন্দী করে সে খবর বড়লাট সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন।

স্যার জনশোর ছিলেন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি অবশ্য মূল পত্রলেখকের প্রতি উদার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে বলেন। ফলে, পত্রলেখককে শাস্তিদানের বদলে তার বিবরণসহ তাকে নেপালের মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ-ভাবে নেপালের সঙ্গে কোম্পানীর আসন্ন সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।

ব্যাপারটি অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। এর পরেও কোচবিহার থেকে শমশির শাহের অনুসারী ফকীরদেরকে বোদা, পাটগ্রাম, পুরুভাগ এলাকা থেকে বন্দী করা হয়েছিল (অক্টোবর, ১৭৯৪ ঈ.)। অবশেষে বড়লাট কাউন্সিল থেকে সর্বসম্মতভাবে ফকীরদের দমনের জন্য এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তানুসারে দিনাজপুর, পুর্ণিয়া ও রঙ্গপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁরা যে প্রত্যেকটি প্রচলিত ভাষায় প্রত্যেক থানা ও জমিদারী কাছারীসমূহে এই মর্মে ইশ্‌তিহার মারফত জানিয়ে দেন যে, সশস্ত্র ফকীরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যে কোন লোক যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে পারবেন। এতে যদি খুন-খারাবীও হয়, তার জন্য কেউ কোনভাবে দায়ী হবে না। শুধু তাই নয়, ফকীরদের জন্য যে কোন রকমের অস্ত্র রাখাও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ অভিযান পরিচালিত হওয়ায় ফকীর-সন্ন্যাসী নয় শুধু, দেশবাসীও এক রকম নিরস্ত্র হয়। ফলে ফকীর আন্দোলন দমন তো হয়ই, উপরন্তু আরও কিছু হয়।

বাংলাদেশে তথা অচিরেই এই উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভূত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর কায়েম হয়।

॥ চৌদ্দ ॥

যত দোষ নন্দ ঘোষ

কথায় বলে, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'।

হয়ত ঘোষ বেচারা জানেই না যে, সে কি দোষ করেছে। অথচ কথাটা যে কত সত্যি, আঠারো শতকের ফকীর আন্দোলনের ইতিহাস পড়লে তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না।

১৭৭২ সালের ২৫শে জানুয়ারি।

রাজশাহীর তত্ত্বাবধায়ক নাটোর থেকে রেভিনিউ বোর্ডকে এই মর্মে এক চিঠি লিখেন যে, মজনু শাহ ও তাঁর অনুসারীরা শেলবর্ষ (Selberis) পরগনার কইগাঙ এলাকার নূরনগর গ্রাম থেকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ও জিয়াসিং গ্রামের কাছারী থেকে ১,৬৯০ (এক হাজার ছয়শ' নব্বুই) টাকা হস্তগত করেছে।

এই একই চিঠিতে আছে যে, মজনু ইতিপূর্বেই তাঁর অনুসারীদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন কেউ কোনরূপ অনাচার না করে।

পত্র লেখকের হিসেব মতে, এই যাত্রায় মজনু শাহের সঙ্গে দু'টি উট, চল্লিশটি রকেট, চার শ' ম্যাচলক-চালক ও দুটি সুইবল (Swivals) সহ সর্বমোট এক হাজার লোক ছিল। মজনু ছিলেন একটি উচ্চমানের ঘোড়ায় চড়ে। তাঁদের কয়েকজন ভালো টাট্টু ঘোড়াতেও চড়েছিলেন।

লক্ষ্যযোগ্য যে, এই বিবৃতিতে স্বতঃবিরোধিতার আভাস আছে। বিবৃতিদাতাই বলেছেন, মজনুর লোকেরা কোনরূপ লুটতরাজের আশ্রয় যেন না নেয়, ইতিপূর্বে স্বয়ং মজনুই তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর বা তাঁর দলের এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যই নেই, তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোন কিছু দান করেন, তা গ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে সরকারী বিবৃতিতে মজনুর দলের লোকের লুটতরাজের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সরকারী বিবৃতি থেকে আরও জানা যায়, এরপর তাঁর দল বগুড়া জিলার কুসুম্বী পরগনায় যায়। সেখানে তারা কোন জোরজবরদস্তির আশ্রয় গ্রহণ করেনি। কিছু দিন পরে রঙ্গপুরের তত্ত্বাবধায়ক পার্লিং সাহেব লিখেন যে, মজনুর নেতৃত্বে আড়াই হাজার ফকীরের একটি দল ঘোড়াঘাট এসে পৌঁছেছে এবং তারা সেখানকার প্রজাদের উপর নানা রকমের অত্যাচার

শুরু করে দিয়েছে। পার্লিং সাহেব আরও লিখেছেন যে, তিনি তৎকালীন দিনাজপুরের রাজার কাছ থেকে এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বলাবাহুল্য, পার্লিং সাহেব এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সৈন্যের সাহায্যও ভিক্ষা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই টমাস সাহেবই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও হেস্টিংস সাহেবের পত্রে উল্লিখিত ক্যাপ্টেন টমাস।

অবশ্য এই সৈন্য পাঠানোর আগেই মিঃ পার্লিং জানিয়েছেন যে, মজনুর দল বগুড়া ত্যাগ করে গেছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, মজনু-সম্প্রদায়ের বগুড়া ত্যাগের অব্যবহিত পরেই স্থানীয় জমিদারগণ ফকীরদের কাল্পনিক অত্যাচার ও লুটতরাজের কাহিনী কোম্পানী কর্তৃপক্ষের শ্রুতিগোচর করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ জন্যে প্রজাদের তরফ থেকে কর মওকুফের দাবিও উত্থাপিত হয়েছিল।

কোম্পানী কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই সব দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন, তাই জমিদারদের দাবি-দাওয়ার অসারতার কথাও তাঁরা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে ১৭৮৪ সালের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা যায়।

ময়মনসিংহ জিলার ফকীরশাহী, শেরপুর ও আলেপসিং-এর জমিদারগণের তরফ থেকে এই ধরনের একটি সংবাদ পেশ করা হয় যে, মজনুর সহকারী মুসা শাহের নেতৃত্বে একদল ফকীর তাদের এলাকায় ব্যাপকভাবে লুটতরাজ করায় উক্ত পরগনাসমূহের প্রজাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ; এমন কি প্রজারা ফকীরদের অত্যাচারে আপনাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিভাগীয় কাউন্সিলের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঘটনাটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ স্পষ্টই বলেছেন ঃ

"This complaint was somewhat exaggarated." কেননা, ১৭৮৪ ঈসায়ী ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকার প্রধান মিঃ ডে জানিয়েছেন, কর মওকুফের জন্য জমিদারদের এ এক অপকৌশল মাত্র। মিঃ ডে লিখেছেন ঃ

"About six weeks ago a complaint was made to me by the naibs of Mymensing, Jafarshahi, Sharepore and Alpsing respecting a body of Sunnasses that were about to enter their districts. I immediately sent orders to the company of sepoys stationed at Bygunbarry to march and stop their entrance, this they accordingly did, an affray issued and the Sunnasses retreated, since which nothing has been heard of them ; the assertion of the Naibs respecting plunder is false, the

Sunnasses were repulsed before they entered either of the Pargunnahs and none of the ryots as I can hear of here fled from their habitations."[৪৯]

অর্থাৎ কর মওকুফ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই ধরনের মিথ্যা কাহিনী জমিদাররাই রটনা করেছেন। কেননা, যে সন্ন্যাসীরা (যে সাহেবের বিবৃতি মতে) উক্ত পরগনাসমূহে হাজিরই হতে পারেনি, তাদের লুটতরাজের কাহিনী সত্য হতে পারে কিভাবে?

অবশ্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তখন শত্রু দমনের জন্য এমন বেখেয়াল এবং অন্ধ হয়ে নেমেছিলো যে, ফকীরদের নাম শুনলেই তারা যেন আঁতকে উঠত। ফলে সুযোগ-সন্ধানীগণও কর্তৃপক্ষের কানভারি করবার জন্য ফকীরদের বিরুদ্ধে নানারূপ কল্পিত লুটতরাজের কাহিনী বর্ণনা করত। ইতিপূর্বে বর্ণিত মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর রাজপরিবারের পলায়ন কাহিনীকে এই শ্রেণীর কাহিনীর নমুনা বলা যেতে পারে।

আরও একটি কথা। ১৭৯৪ সালে মালদহের পাচলিজঙ্গলের কাছে যহুরী (Jawhurry) শাহ্ ও মতীয়ুল্লাহ নামে দু'জন দস্যুনেতা দলবলসহ ধরা পড়ে। এরা দু'জনেই ফকীর নেতা বলে অনুমিত হয়। কিন্তু পরে জানা যায়, মতীয়ুল্লাহ্ একজন জাল সরকারী কর্মচারী (জমাদার)। একখানি জাল ফরমান তৈরি করে কিছু সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করে লুটতরাজে নেমে পড়েছিল। বলাবহুল্য, মতীয়ুল্লাহ্র মতো নকল ফকীর নেতা গজিয়ে ওঠেনি, তারই বা প্রমাণ কি? বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীরূপে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে যখন ফকীর পরিচয় দেওয়াটা নযরানা আদায়ের জন্য সুবিধাজনক ছিল। বলারাহুল্য, বিচারে যহুরী শাহের আঠারো বৎসর এবং মতীয়ুল্লাহ্র দশ বৎসরের জেল হয়।[৫০]

উল্লেখ্য যে, পাচলিজঙ্গলে সোবহান আলী শাহের দলের একটি পাকা গোলাঘর বা অস্ত্রাগার ছিল এবং যহুরী শাহ সোবহান আলীর সম্প্রদায়ভুক্ত।[৫১]

প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে স্থানীয় জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যায়।

মহামতি বার্ক অভিযোগ করেছেন যে, ইংরেজ কোম্পানীর রাষ্ট্রশাসনের ব্যর্থতার

---

৪৯. Letter from M. Day, chief of Dacca, to the Committee of Revenue, dated 16th February, 1784, P. 149.
Quoted in the Sannayasi and Fakir Raiders in Bengal, P. 90.

৫০. ঘোষ, পৃ. ১৩১।

৫১. ঘোষ, পৃ. ১৩১।
"The Fakirs had a pakka magazine in the Puchlejungle near Maldah in which the Fakirs deposited their arms and ammunitions." বলাবাহুল্য, এরূপ আরও অস্ত্রাগার ও কেল্লা তাদের দেশের বহু স্থানেই ছিল।

মূলে ছিল হেস্টিংসের ত্রুটিপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি ; কেননা, তিনি মনে করতেন, ইংরেজগণ কয়েকজন কোম্পানীর অনুগৃহীত ব্যক্তির সাহায্যে (যেমন দেবী সিংহ, হরগোবিন্দ সিংহ্ প্রমুখ) রাজ্যশাসন বা রাজস্বনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে পূর্বতন মুঘল শাসনের পদ্ধতি অনুসারে স্থানীয় জমিদারগণের মাধ্যমে (যাঁরা এ দেশের সত্যিকারের শাসক ছিলেন) দেশ শাসন করতেন, তাহলে তাঁদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। অবশ্য কোম্পানী জমিদারদেরকে উপেক্ষা করেননি, তবে খুব সম্ভব, তাঁদের দেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁরা আস্থা রাখতে পারেন নি, নিজস্ব এজেন্ট বা দালাল নিয়ুক্ত করতে হয়েছে।[৫২].

৫২. Marshall, Ibid, P. 181.

॥ পনেরো ॥

জমিদারদের ভূমিকা

"The Principal Zaminders in most parts of the districts have always a banditti ready to let loose ....."--Hunter.

সরকারী বিবৃতি ও অন্যান্য কাগজপত্র থেকে জানা যায়, স্থানীয় জমিদারগণ হয় ফকীর-সন্ন্যাসীদের মতো স্বাধীনভাবে ডাকাতি করতেন, নয় কোম্পানীপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর শ্বশুর হরবল্লভকে শেষোক্ত শ্রেণীর জমিদারদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন।

অবশ্য হরবল্লভের মতো গোয়েন্দা জমিদারদের প্রতিও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বিশেষ সদয় ছিলেন না। সর্বদাই তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হত ; স্বয়ং হান্টার সাহেবও তা স্বীকার করেছেন। এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়েও সে বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ফকীর আন্দোলনে জমিদারদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে নাজুক। তাঁরা পড়েছিলেন উভয় সঙ্কটে। একে ফকীরেরা স্বাধীনচেতা, তাতে একেবারে বেপরোয়া ; পক্ষান্তরে কোম্পানীর রাজত্বও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যায়—"তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন-পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল ; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। ...আর তখন বাংলাদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তেও অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।"[৫৩] ফলে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির যে টানাপড়েন চলছিল, জমিদারগণ তার মধ্যস্বত্বভোগী হওয়ায় তাঁদের অবস্থাই বিশেষ সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছিল। আর তাছাড়া ছিয়াত্তরের পরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও আশাতীতরূপে ভেঙে পড়েছিল। আবার একদিকে ফকীরদের উৎপাত, অন্যদিকে কোম্পানীর দৌরাত্ম্য, বেচারাগণ তখন কোন্ দিকে যাবেন ? ডাঙ্গায় বাঘ, আর পানিতে কুমীরের দশা আর কি। অবশ্য চিরদিন যা হয়ে আসছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ; জমিদারগণ এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে কাটিয়ে উঠলেন। দেবীসিংহের ইজারা ব্যর্থ হওয়ার পর কোম্পানীও এ বিষয়ে সচেতন

---

৫৩. সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

হয়ে নীতি নির্ধারণ করতে ইতস্তত করলেন না। হেস্টিংস যে নীতি-নির্ধারণে ব্যর্থ হলেন, লর্ড কর্নওয়ালিস তাকে শক্ত জমীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোম্পানীর শক্তি বাংলার মাটিতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। জমিদারগণেরও এই সুযোগে পোয়াবারো হল। অবশ্য সকলেই যে সরফরাজ হলেন তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রজেশ্বর ও তৎপিতা হরবল্লভদেরই জয় হল। ফলে, দেবী চৌধুরাণীর বজরাও ভেঙে ফেলতে হল। মানে, দেশে কোম্পানীর শাসন স্থায়িভাবে কায়েম হল। স্যার যদুনাথের ভাষাতেই বলা যায়—"দেবী চৌধুরাণীতে বর্ণিত যুগে ইংরেজরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারীগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্বদেশেই দেখিয়াছেন যে, এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। ...কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফঃস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ এবং রাজস্বের নির্দিষ্টতা আনিয়া দেয়। কিন্তু তাহা যখন ঘটে, তখন 'দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে' এবং প্রফুল্ল একপাল 'বড় ডব ডবে চোখ, গালফুলো' জমিদার শাবক পালন করিতে ব্যস্ত ; ডাকাত রাণীর বজরা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—তখন আর তাহার আবশ্যকতা নাই।"[৫৪]

৫৪. সরকার (শতবার্ষিকী সংস্করণ দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকা), পৃ. ৬

॥ ষোলো ॥

ফকীর-সন্ন্যাসী বিরোধ

১৭৮৬ সালের ২রা মার্চ তারিখে লিখিত বগুড়ার কালেক্টর মিঃ চ্যাম্পিয়নের এক পত্রে জানা যায়, সমকালে একদল হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মুসলমান ফকীরদের এক ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গায় মজনুর দলের অনেকে নিহত হয়।[৫৫]

এই দাঙ্গা ১৭৭৭ সালের কোন এক সময়ে বগুড়া জিলার চাম্পাপুকুরের ফকীর কাটাখালের পার্শ্বে সংঘটিত হয়। বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন এভাবে—"এই জেলায় (বগুড়া) ...মজনু ফকীর নামক...একজন দুর্দান্ত দস্যুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এই দস্যু যে গ্রামে আপতিত হইত, তথায় প্রথমতঃ গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া তৎপর লুণ্ঠন করিত। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একদল অশ্বারোহী নাগা সন্ন্যাসী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে সহসা এতদ্দেশে আগমন করতঃ চাঁপাপুকুরের নিকট ফকীর কাটাবিলের পার্শ্বে মজনুর দলের সহিত যুদ্ধারম্ভ করে। এই যুদ্ধে মজনু সদলে নিহত হয়। তাহার একটি মাত্র শিশুপুত্র জীবিত থাকে। নাগাগণ তৎপর ময়মনসিংহে ও তথা হইতে গোয়ালপাড়া অভিমুখে প্রস্থান করে। গোয়ালপাড়ায় ইহারা একদল অর্ধপর্তুগীজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তৎপর হইতে উহাদের আর কোন সন্ধানপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।"[৫৬]

মিঃ সেন এই বৃত্তান্ত কোথা থেকে পেয়েছেন, তার কোন উল্লেখ করেন নি। কিন্তু চাম্পাপুকুরের দাঙ্গায় যে মজনু ফকীরের মৃত্যু হয়নি, উপরিউক্ত মিঃ চ্যাম্পিয়নের বিবৃতি থেকেই জানা যাচ্ছে।

মিঃ চ্যাম্পিয়ন আরও উল্লেখ করেছেন যে, এটি তাদের পূর্ববর্তী কোন কলহের পরিণাম। বলাবাহুল্য, ফকীর-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইতিপূর্বেও, এমন কি পরেও একাধিকবার এই ধরনের দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল ; এবং যতদূর মনে হয় এটি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফল নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৭৮২ সালে ময়মনসিংহের শেরপুরে এক গহী-সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে মজনু দলের এক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় ৩০ অথবা ৪০ জন সন্ন্যাসী নিহত হয়। এই সন্ন্যাসীরা 'রামাইয়্যাত' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। মজনুর সঙ্গে প্রায়

---

৫৫. ঘোষ, পৃ. ৯৪।
৫৬. প্রভাসচন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস (বগুড়া, ১৩৩৬-১৯২৯, ২য় সং), পৃ. ১৩৮-৩৯।

দেড় হাজার ফকীর ছিল। তারা আশংকা করেছিল যে, শেরপুরের নিকট দিয়ে প্রায় ৬০০ সন্ন্যাসীর যে দলটি ইতিপূর্বে অতিক্রম করেছিল, তারা ফেরার পথে তাদের বন্ধুদের এ হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ঘটনাটির উল্লেখকালে মিঃ লজ, ময়মনসিংহের নিকবর্তী বেগুনবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে, তাঁর ধারণা, সন্ন্যাসীরা এর প্রতিশোধ নেবে কি, তারাই বরং ফকীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এখানে লুটতরাজে অংশ নেবে। কেননা, তাদের উভয়েরই লক্ষ্য যে এক, মানে—লুটপাট করা। মিঃ লজের ধারণা সত্য হয়েছিল।

পরবর্তী ১০ই ডিসেম্বর তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব রেভিনিউ বোর্ড এই মর্মে এক চিঠি পাঠান যে, প্রায় ৭০০ লোকের একদল হিন্দু-সন্ন্যাসী ভিতরবন্দ পরগনাতে মুসলমান ফকীরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসে দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছে। এদেরকে দমন করবার জন্য লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়োগ করা হয়। ১৮০ জন কোম্পানী সৈন্যসহ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যাত্রা করেন।

জানা যায়, এই যাত্রায় ফকীর নেতা মুসা শাহ্ ও সন্ন্যাসী-নেতা মোহন গিরি ধৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, রেভিনিউ কমিটি এ ব্যাপারে গুডল্যাড সাহেবকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিচার যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ হয় এবং এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ যেন হাজির করা হয় যদ্বারা তাদের দোষ যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় ; এমনকি ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ডকে আক্রমণের পূর্বে তাদের কি লেনদেন হয় এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা কিরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারও যথাযথ বিবরণ যেন উদ্‌ঘাটিত হয়। এই সঙ্গে আরও বলা হয় যে, বিচারে যদি কারও মৃত্যুদণ্ড বা অনুরূপ কোন শাস্তির ব্যবস্থা না হয়, তাহলে বন্দীগণকে সম্মানিত বোর্ডের অনুমতি লাভের পূর্বে মুক্তি দেওয়া না হয়।[৫৭]

এ থেকে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ফকীর-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আর যাই থাক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। আর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বা কোম্পানী-বিদ্বেষ তাদের সহজাত ছিল বলা যেতে পারে।

এতদ্ব্যতীত নেপালী সুবার সঙ্গে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের যে বোঝাপড়া হয়, এবং নেপালী সুবা ও নেপাল রাজ যে মনোভাবের পরিচয় দেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, তারা যথার্থ পাপী নয়, অথচ সাজা পেতে হল তাদেরই।

---

৫৭ ঘোষ, পৃ. ৮৪-৮৫।

॥ সতেরো ॥

উপসংহার

ফকীর ও সন্ন্যাসী নামধারীদের হামলা ও সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুটতরাজের কাহিনী এ দেশে নতুন নয়।

নবাব আলীবর্দী খানের আমলে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের লুটতরাজের কাহিনী ইতিহাসে 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে খ্যাত। আজও বাঙালি ছেলেমেয়েরা সে সংক্রান্ত ছড়া-গান শুনে নাকি ঘুমায়।

অর্থ তার যাই থাক, বাঙালি মায়েরা আজও সশঙ্ক চিত্তে সে গান করে তাদের ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াবার প্রয়াস পায়, যথা—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ।।"

আঠারো শতকের ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অবশ্য আজও আমাদের ঘুমপড়ানী ঐতিহ্যে পরিণত হয়নি। তার কারণ হয়ত এই যে, সমকালীন ইংরেজ সরকার যা-ই বলুন, আমাদের দেশের আপামার জনসাধারণ আজও সন্ন্যাসী বা ফকীরের নামে ভীত নয় এবং কোনদিন এরূপ ছিল এমনও মনে করবার কোন কারণ ছিল মনে করতে পারা যাচ্ছে না। অন্তত এঁদের নামে তথাকথিত যে হামলা বা লুটতরাজের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা থেকেই এরূপ অনুমান করবার অবকাশ আছে।

এক-আধটি উদাহরণ দেওয়া যাক

প্রথমত, সন্ন্যাসী ফকীরেরা ধন-সম্পদ লুট করেছে ও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

এর জবাবে বলা যায় ঃ কার সম্পদ লুট করেছে এবং অসন্তোষই বা কার ?

লুট করেছে সরকারী খাজাঞ্চীখানা ও আক্রমণ করেছে সরকারী তথা ইংরেজ কুঠিয়ালদের কুঠিসমূহে। যেমন—

১৭৬৩ সালে হেস্টিংস সাহেবের যে চিঠিতে সন্ন্যাসীদের আক্রমণের প্রাচীনতম বিবরণী লিখিত আছে, সেটিও বাখেরগঞ্জের স্বয়ং হেস্টিংস সাহেবের প্রতিনিধি মিঃ কেলী সংক্রান্ত।

'ক্লাইভ' সাহেব কথিত 'ঢাকা ফ্যাক্টরী' আক্রমণ, ঐ সময়ে রাজশাহীর 'রামপুর বোয়ালিয়া'র রেশম কুঠি আক্রমণও তার ব্যতিক্রম নয়। আর তাছাড়া কোচবিহার রাজ্যের বিশৃঙ্খলা এবং সে সম্পর্কিত হাঙ্গামার কথা তো স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত করে যে, এগুলি রীতিমত রাজনৈতিক ঘটনা।

হান্টার সাহেব স্পষ্টই বলেছেন, ক্যাপ্টেন টমাস হত্যার কালে 'নিরন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত' প্রজারা বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়েছিল। হেস্টিংস সাহেবও বলেছেন, দেশবাসীরা এদের অত্যাচার-নির্যাতন অম্লান বদনে সয়ে যায়, এমন কি চরমভাবে নির্যাতিত হয়েও তারা এদের ব্যাপারে কোন খবর বলতে চায় না।

রতিরাম রায় বলেছেন, অত্যাচারিত ও নিরন্ন প্রজাকুল বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ কথাও বলতে ভুলেন নি যে, একশ্রেণীর ভদ্রলোক (জমিদার শ্রেণীর) মজা দেখতেও এসেছিল।

পঞ্চানন দাস বলেছেন, মজনু ডাকাত বটে, তবে তাঁর চালচলন 'সাহেব সুবা'র মতো।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী ডাকাত বটে, তবে ডাকাতী করা তখনকার দিনে দোষের ছিল না। কেননা, "এ...সময়ে ডাকাতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্বল বা গণ্ডমূর্খ তাহারাই 'ভালো মানুষ' হইত।"

মজনু শাহ্, মূসা শাহ্, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, চেরাগ আলী, পরাগ আলী প্রমুখ কোম্পানী কর্তপক্ষকে এ দেশের ন্যায়সঙ্গত রাজা বলে মানতেন না। তাই বারেবারেই তাদের 'দস্তক' বা ফরমান অগ্রাহ্য করেছেন।

মজনু শাহ নাটোরের বিখ্যাত রাণী-ভবানীকে এ কথা স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছিলেন—"নিরীহ অসহায় ফকীর সম্প্রদায়কে হত্যা করে ইংরেজ সরকারের কি লাভ?" নেপালী সুবাও বলেছেন, "তারা ভিক্ষে করে খায়; তাদের বন্দী করে আমাদের কি লাভ হবে?"

কোম্পানী কর্তৃপক্ষ যা-ই বলুন না কেন, ফকীর বা সন্ন্যাসীরা স্বদেশের বা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ করেনি; তারা বিদেশী রাজার রাজত্ব ও তাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে। অবশ্য তাদের দ্বারা অনাচার হয়নি তা নয়, তবে ভুল-ত্রুটি মানুষেরই হয়; সেই হিসেবে তাদেরও হয়ত হয়েছিল। কিন্তু তারা স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ছিল না। কেউ কোনদিন শুনেছেন কি, চোর-ডাকাতেরা কেল্লা বা দুর্গ তৈরি করে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পোষে বা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়?

মজনু শাহ্ বগুড়ার 'মস্তানগড়ে' একটি কেল্লা তৈরি করেছিলেন বলে স্বয়ং বগুড়ার কালেক্টর মিঃ গ্লাডউইনই উল্লেখ করেছেন। যতদূর জানা যায়, বগুড়ার গোহাইলের

নিকটবর্তী মাদারগঞ্জে, মুমিনশাহী জিলার মধুপুর জঙ্গলে ও মালদহের পাচলিজঙ্গলে মজনু সম্প্রদায়ের কেল্লা ও গোলা-বারুদের কয়েকটি আড়ত ছিল। শেষোক্ত পাচলিজঙ্গলের কেল্লা বা অস্ত্রাগারটি ছিল পাকা ইমারতের।

ফকীরেরা প্রথমে সাধারণভাবে তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্মকার্যে জীবনাতিবাহিত করত। অনেকে বিবিধ বিষয়ে বিকিকিনিও করত। কিন্তু সরকার পক্ষ যখন তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় বাধা দিল বা তীর্থদর্শনার্থী ফকীরদের উপর নানা নির্যাতন, এমন কি হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হল না তখন তারা একতাবদ্ধ হয়ে তার প্রতিবাদ জানালো। ফলে রাজশক্তি ও ফকীর-শক্তিতে সংঘর্ষ হল। এই সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপান্তরিত হল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিরূপ ভয়াবহ হয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে মিঃ গ্লাডউইনের নিম্নলিখিত উক্তিতে—"Not a bengali rabble but a well armed Rajput." অর্থাৎ তারা বিশৃঙ্খল বাঙালি নয়, ঠিক যেন সুগঠিত রাজপুত বাহিনী।

আর একজন ইংরেজ কর্মচারীর উক্তি—"(They) are armed and dressed in the same manner as the English troops." অর্থাৎ তারা দেখতে ঠিক সুসজ্জিত ইংরেজবাহিনীর মতো। এসব থেকে কি মনে করা যায়?

সরকারী কর্তৃপক্ষ তো স্বীকারই করেছেন, তাঁদের সমস্ত কলাকৌশল, বিদ্যাবুদ্ধি এই অসাধারণ ফকীর-বিপ্লবীদের কাছে হার মেনেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে মজনু বা তাঁর সহকারীদেরকে বহুবারই পরাজিত ও বিতাড়িত করা হয়েছে; কিন্তু হেস্টিংস সাহেবের ভাষায় বলা যায়, তারা এমন অকস্মাৎ দেশের কেন্দ্রস্থলে সময়মতো হাজির হয়েছে যে মনে হয়েছে—তারা বুঝি আকাশ থেকে নেমে এসেছে। এমন কি গভর্নর-জেনারেলকে লিখিত রেভিনিউ কমিটির চিঠিতেও মজনু-সম্প্রদায়ের অলৌকিক গঠন-শক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

তাই বলাবাহুল্য, এতগুলি আসাধারণ গুণের আধার যে ফকীর দল, তারা যদি দস্যু-তস্করই হয়, তাদের প্রশংসা না করে পারা যায় কি? কিন্তু আফসোসের বিষয়, এদের এই বিপ্লব-কাহিনী আজও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্থান লাভ করেনি, অচিরেই সে কাজে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষ করে আমাদের ইতিহাস-দফতর এ বিষয় সক্রিয় হবেন, এরূপ আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

পুনশ্চ ঃ

সম্প্রতি ফকীর নেতা মজনু শাহের পরিচিতি নিয়ে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

কেউ কেউ এমন কথাও বলতে চেয়েছেন যে, 'মজনু শাহ্' ছদ্মনামে স্বয়ং নবাব মীর কাশিমই ব্রিটিশ-বিরোধী আযাদী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় দল মনে করেন, নবাব সিরাজদ্দৌলার স্থলে নূর মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে নবাব নিযুক্ত করা হয়; এই নূর মুহাম্মদই পরবর্তীকালে রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন (১৭৮৩) ইত্যাদি।

মতান্তরে, এই নূর মুহম্মদের আসল নাম ছিল নবাব বাকের মুহম্মদ হুসাইন জঙ্গ বাহাদুর ওরফে বাকের জঙ্গ। ছদ্মনামে ইনিই ছিলেন মজনু শাহ্।

এই সব ধারণা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, বর্তমান গ্রন্থেই তার জবাব আছে। আর তাছাড়া যাঁদের সঙ্গে মজনু শাহের একাত্মতার কথা বলা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নেই।

নবাব মীর কাসিম ফকীরের বেশে আত্মগোপন করেছিলেন, এ-কথা সত্যি; তবে তিনি যে মজনু শাহ্ হতে পারেন না তার প্রমাণ—নবাব মীর কাসিম ১৭৭৭ সালে দিল্লীর এক অখ্যাত এলাকায় মৃত্যুমুখে পতিত হন ; পক্ষান্তরে মজনু শাহের ওফাত হয় ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে আলোয়ার রাজ্যের অন্তর্গত (পাঞ্জাব) মাখনপুরে এবং তার কবরও হয় মেওয়াত জিলার ধুলী নদীর তীরে।

দ্বিতীয় মতটিও ভ্রান্ত; কেননা 'বাক্যের জঙ্গ' নামে কোন ব্যক্তি দিল্লী থেকে নবাবী সনদ নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন, তার কোন প্রমাণ আজও মেলেনি। পক্ষান্তরে, নবাব নূরউদ্দীন নবাব হলেও তাকে Self-styled নবাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মানে, প্রজারাই তাঁকে নবাব করেছে, কোন রাজা বা বাদশার নির্বাচিত শাসক তিনি ছিলেন না। আর নবাব নূরউদ্দীনের 'মজনু শাহ' হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, কেননা, ১৭৮৩ সালের রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহের অত্যল্পকাল পরেই তিনি ওফাত পান। খুব সম্ভব নবাব নূরউদ্দীন রঙ্গপুর জিলারই বাসিন্দা ছিলেন; তার সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা হয়নি।

মজনুর উত্তরাধিকারী মুসা শাহ্ সম্পর্কেও ধারণা করা হচ্ছে যে, তিনিও উনিশ শতকের বিখ্যাত 'প্রেমরত্ন' (১৮৫৩) রচয়িতা কবি জামালউদ্দীনের পিতা মুসা শাহ্ ওরফে মুনশী কাদিরুল্লাহ্ একই ব্যক্তি

কিন্তু এই ধারণাও যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে কবি জামালউদ্দীনের পিতা মূসা মিয়াও একজন কবি ছিলেন। তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ ছিল। তার মধ্যে একখানির (রসনামা) রচনাকাল ১২২৮ সাল (১৮২১ ঈ.)। পক্ষান্তরে ফকীর নেতা মুসা শাহের ইন্তিকাল হয় ১৭৯৩ ঈসায়ীর কোন এক সময়ে। তাই এঁরা দু'জন যে একই ব্যক্তি হতে পারেন না, এ-কথা বলাই বাহুল্য।[৫৮]

অবশ্য ফকীর আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়। তাই এ অধ্যায় নিয়ে মতভেদ, মতান্তর হওয়ার অবকাশ রয়েছে। সুধীসমাজেরও তাই দায়িত্ব রয়েছে, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার, গবেষণা করার এবং শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার।

---

৫৮. মুহম্মদ আবু তালিব, বাংলা সাহিত্যের ধারা (রাজশাহী, ১৯৬৮), পৃ. ২২৮-২২৯

পরিশিষ্ট ঃ ১

মজনুর কবিতা

[মূল দলীল-দস্তাবীজ থেকে]

শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বারনা।
কালান্তক যম বেটার কে বলে ফকীর।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।।
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আপে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান।।
উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগ্দা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি।।
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি।
দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধূম।
বড়ই দুক্ষিত হৈল পলাইব কোথা।
মন দিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা।।
যেদিন যেখানে যা'রা করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া।।
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া।।
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
গাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছ্যাড়া গুড়।।
নারী লোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
সর্ব্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় নড়।।
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওয়াল।।
বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়া দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়া পলায় সন্ন্যাসী।।

থাল, লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।
টাকার লালচে চিরে শিওরে বালিশ।।
আল্‌দা মাটি দেখি ফকীর করে পোচ পেচ।
টাকার লাগি যে মারে বাক্সের খোচ।।
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া।।
ভাল মানুষের কুলবধু জঙ্গলে পলায়।
লুটুরা ফকীর যত পাছে পাছে ধায়।।
যদি আসি লাগ পাস জঙ্গল ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর।।
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকতি করি কি বলে বচন।।
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাতপাও।
অতিথ ফকীর তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও।।
ফকির হইয়া কর ছাগলের কাজ।
পরিণামে দুঃখ পাবা ইশ্বর সমাজ।
সুজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কানে।
অধম ফকির হাত বাড়ায় যৌবনে।।
পরিণাম নাহি শুনে করয়ে শিঙ্গার।
দৌড়িয়া যাইতে কাড়ি লয় বস্ত্র অলঙ্কার।
লাজে নাহি কহে কথা রাখে গুপ্ত ভাবে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে।।
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক।।
কোন দেশ হৈতে আইল অধম।
ইহাকে ভারতে থুয়া পাশরিছে যম।।

ইতি মজনুর কবিতা সমাপ্ত।

সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্তিক।[৫৭]

---

৫৭. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা থেকে (১৩১৭ সাল ১৯১০, পঞ্চম সংখ্যা) যামিনী মোহন ঘোষের 'সন্নাসী ফকীর' ইত্যাদি গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত। প্রদত্ত তারিখ রচনার কি লিপিকালের বোঝা মুশকিল। খুব সম্ভব লিপিকালের হবে।

মস্তানগড়ের ইতিহাস (পৃ. ৫২-৫৩)

"ঐতিহাসিক কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রনগর হইতে অভিন্ন। ঐতরের আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, পুণ্ড্রদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।......

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থানগড়ের নাম 'মুস্তানগড়' রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের মহাস্থান নাম হওয়ার সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতুঃষষ্ঠী দোষ বিবর্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্তী এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন এবং এই স্থানে তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার 'মহাস্থান' নাম দেন। স্মরণাতীতকাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এই স্থানে পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড্রনগর পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়।...

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাস্থানে হিন্দু প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাস্থান মুসলমানগণের দ্বারা বিজিত হয়। প্রবাদ, শাহ সুলতান হযরত আউলিয়া নামক বাল্খ প্রদেশ (প্রাচীন বাহলীক) বাসী জনৈক মুসলমান সাধু মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। কথিত আছে শাহ্ সুলতান একটি বিরাট মৎস্যের উপর আরোহণ করিয়া করতোয়া নদী দিয়া যাতায়ত করিতেন। তজ্জন্য লোকে তাহার উপাধি দিয়াছিল 'মাহীসওয়ার' বা মৎস্যারোহী।.....

মহাস্থানের দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রাচীন দুর্গ সর্ব্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব্ব দিকে প্রাকার এখনও অনেক স্থলে অভগ্ন অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ইষ্টকের সোপানশ্রেণী পার হইয়া মহাস্থানগড় বিজয়ী পীর শাহ্ সুলতানের সমাধি বা দরগাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগাহের নিম্নভাগ প্রস্তর নির্মিত ও ঊর্ধ্বভাগ ইষ্টকের দ্বারা প্রস্তুত।"

দেবীসিংহ বনাম মজনু-ভবানী (পৃ. ১৮-৩৫)

"ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলে রংপুর জিলা বহুদিন ধরিয়া অশান্তি ও উপদ্রবের কেন্দ্র ছিল। শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলার জন্য এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে উত্তরবঙ্গের প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে এবং ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ নামক দুইজন দলপতির নেতৃত্বে তাহারা নানাস্থানে লুটপাট চালাইতে থাকে। এই দলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ছিল। প্রথমতঃ রংপুরের কালেক্টর প্রেরিত বরকন্দাজ সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হয় না।

পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে ইহাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। লেঃ ব্রেনান জনৈক দেশীয় ব্যক্তির সাহায্যে ভবানী পাঠকের বজরা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করেন। লেঃ ব্রেনানের রিপোর্ট হইতে দেবী চৌধুরাণী নাম্নী জনৈকা দস্যু নেত্রীর কাহিনীও অবগত হওয়া যায়। ইনি নৌকায় বাস করিতেন। ইঁহার অধীনে বহু সৈন্য-সামন্ত ছিল এবং ভবানী পাঠকও তাঁহার দলভুক্ত ছিলেন। এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "দেবী চৌধুরাণী" নামক যে অমর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত।..."[৬০]

"দেবীসিংহের কর্মস্থল ছিল দিনাজপুর ও রংপুর। দিনাজপুর শহরস্থিত গুড়গোলা মৌজায় ঘাঘরা নদীর পূর্বতীরে যে একটি ভগ্নমান প্রাসাদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তাহাই দেবীসিংহের কুঠি। এই কুঠিকে সেকালের রাজাবাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি বিরাট আয়তনের মধ্যে বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দ্বিতল প্রাসাদ, অন্দরমহল, চোরকুঠী, কাছারী বাড়ী, লৌহগরাদবিশিষ্ট বন্দীশালা, এবং চতুর্দিকে প্রাকারবেশিষ্টত হইয়া দেবীসিংহের কুঠিবাড়ী অবস্থিত ছিল। ইহা দেবী সিংহ কতৃক নির্মিত কুঠিবারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে, ইহা স্থানীয় অঞ্চলে মারাজ বাহাদুর সিংহের বাড়ী নামেই সমধিক পরিচিত। বাহাদুর সিংহ ছিলেন দেবীসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি এতদঞ্চলের খ্যাতিমান জমিদার হিসেবে কোম্পানী সরকার হইতে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন।"[৬১]

বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পূর্ববঙ্গ রেলপথে বাংলাদেশ), পৃ. ১০-১২

৬০. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৬১. মেহরাব আলী। দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস (দিনাজপুর ১৯৬৫), পৃ. ৪-৫

পরিশিষ্ট ঃ ২

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

১০ই কার্তিক, ১৩৭৯, মুতাবেক ১৯৭২ সালের ২৩শে অক্টোবর, দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে' শিরোনামায় আমার (মুহম্মদ আবূ তালিব) একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, লেখাটি আমারই বটে, তবে কিভাবে তা 'দৈনিক বাংলায়' প্রকাশিত হল, তা আমার জানা ছিল না। আর তাছাড়া সেটি আমার কোন নতুন লেখাও নয়, আমারই পূর্বতন প্রকাশিত 'বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে গৃহীত অংশ মাত্র (প্রকাশ-১৯৬৮)। দুর্ভাগ্যক্রমে রচনাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডকটর সিরাজুল ইসলামের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তিনি পরবর্তী ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭২ তারিখে উক্ত পত্রিকার 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' কলামে আমার লেখাটির একটি তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। যার মর্মকথা হল—ফকীর সন্ন্যাসীদের ইতিহাস নিতান্তই বিকৃতভাবে পেশ করা হয়েছে; যাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খল লুটতরাজ ছাড়া কিছু নয়, তাদেরকে দেশপ্রেমিক শক্তিরূপে প্রকাশ করা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, পূর্বতন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তেরও প্রতিকূল।

আমি এতে নিতান্তই বিব্রত বোধ করি এবং এর প্রতিবাদ-স্বরূপ সম্পাদকের কাছে একখানি চিঠি পাঠাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হয় না, তবে তৎস্থলে জনাব মেসবাহুল হক লিখিত একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, পত্রখানিতে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের প্রতিক্রিয়ার জওয়াব দেওয়া হয়। যার ফলে আমার চিঠিখানি প্রকাশের আর প্রয়োজন থাকে না। সুধী সমাজের অবগতির জন্য উভয়পত্রই এখানে হুবহু পেশ করা গেল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সব বাদানুবাদের ফলে ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলনের বিষয়টি সুধী সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনীতেও (রাজশাহী) বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শ্রী রতনলাল চক্রবর্তী। প্রবন্ধটির নাম 'ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলনের কয়েকটি দিক'। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি ইতিহাস সমিতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮১-৮২, পৃ. ৪৩-৪৬)। বালাবাহুল্য,

লেখক আমার 'ফকীর নেতা মজনু শাহ্' (১৯৬৯) গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও অভিমতের সমালোচনা করলেও বিষয়বস্তুটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর এ-বিষয়ে কৌতূহল জাগার মূলে যে পূর্ববর্ণিত 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া'য় ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সাহেবের প্রবন্ধটি ছিল এ কথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেন।

আরও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ঐতিহাসিকগণ ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন বিষয়টিকে বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন, এবং এ নিয়ে নতুন নতুন তথ্যেরও সন্ধান দিচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ বাখরগঞ্জের 'বালাকী শাহ' ও তাঁর আন্দোলনের কথা বলা যায়। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির পঞ্চম বার্ষিক ইতিহাস সম্মিলনে (বরিশাল) শ্রী রতনলাল বালাকী শাহের উপর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য পূর্বোক্ত ডক্টর সিরাজুল ইসলাম ও মেসবাহুল হক সাহেবদ্বয়ের 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' পেশ করা গেল ঃ

ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে

ডক্টর সিরাজুল ইসলাম

গত শুক্রবারের 'দৈনিক বাংলায়' প্রকাশিত জনাব মোহাম্মদ আবূ তালিবের লিখিত 'ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে' নিবন্ধটি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক ফকীর-সন্ন্যাসীদেরকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, এই ফকীর ও সন্ন্যাসীরা সেদিন যে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিলেন, যে আজাদীর আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তারই অনির্বাণ শিখা এসে আমাদের ১৯৪৭ সালের আজাদীর ধারায় যুক্ত হয়েছিল। তাই ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায়ই শুধু নয় আমাদের আজাদী আন্দোলনের আদিধারা—প্রথম আলোর দিশারীও।" পাকিস্তান আমলে অবশ্য 'আজাদী আন্দোলনের আদিধারা' প্রবাহিত হয়েছিল আরও অনেক উপর থেকে, অনেক আগে থেকে। যথা—কেউ কেউ এই ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ থেকে। কেউ মোহাম্মদ বিন কাসিম থেকে। এমন কি প্রচীন সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যেও আজাদীর বীজ খুঁজে পেয়েছেন অনেকে।

লেখককে আমি চিনি না। সুতরাং তিনি ঐতিহাসিক কিনা এবং ঐতিহাসিক হলে কোন মানের ঐতিহাসিক তা জানি না। তবে তিনি ফকীর সন্ন্যাসীদের যে উচ্চাসন দিয়েছেন সে আসন সত্যিকারের কোন ঐতিহাসিক দিতে প্রস্তুত নন।.... বৎসর যাবৎ সরকার প্রকাশিত নথিপত্র ঘেঁটে যা পাওয়া গেছে, তা সহজেই প্রমাণ করে যে ফকীর-সন্ন্যাসীদের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। তাদের কার্যাবলী নিতান্তই ছিল একটি বিশেষ যুগের ফল।

পলাশী বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের শাসন কাঠামো এতই শিথিল হয়ে পড়ে যে এই সময়ে দেশের সর্বস্তরে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। এই সময়ে মোগল শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার স্থলে ইংরেজের শাসন প্রণালীর কোন সঠিক রূপ নেয়নি। ভাষা ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অজ্ঞতার দরুন ইংরেজকে তাদের বাঙ্গালী বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের উপর নিতান্ত নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। এই সুযোগে বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি সম্প্রদায় তাদের প্রভাব খাটিয়ে শুরু করে চরম শোষণ ও অত্যাচার। ফলে অচিরেই দেশের বেশীর ভাগ সম্পদই পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে। এই যুগান্তরকালে একদিকে যেমন কান্তবাবু, দেবী সিং, গোবিন্দ সিং, গোকুল ঘোষাল, জয়নারায়ণ

ঘোষাল, রামচন্দ্র রায়, নবকৃষ্ণ, রামকান্ত রায়, দুলাল রায় প্রমুখ বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিগণ স্বল্পকালের মধ্যে প্রত্যেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী হলেন, অপরদিকে বাংলাদেশের হাজার হাজার বুনিয়াদী পরিবার ইংরেজপূর্ব যুগে যাদের অর্থ ছিল, প্রতাপ ছিল এমন কি অনেকের জনপ্রিয়তাও ছিল, কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। সমাজ বিন্যাসে এহেন ওলট-পালটের ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। সমাজের এইরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় চুরি-ডাকাতি রাহাজানি যেন একটি সম্মানিত পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাকাতি করতে করতে দরবেশ হয়ে গেছেন বা দরবেশ হয়েও ডাকাতি করেন এমন গল্প সমকালীন সাহিত্যে প্রচুর বিদ্যমান। দস্যুবৃত্তি সমাজের প্রতি স্তরে এমনিভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, পুলিশ-দারোগা, জমিদার, রাজস্ব ঠিকাদাররা পর্যন্ত অর্থলাভ ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দস্যুদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিত।

তথাকথিত ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলন সেই যুগান্তর যুগের ঘটনা। তাদের কর্মস্থল প্রধানত কয়েকটি জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন—বীরভূম, বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর, রংপুর, দিনাজপুর, চব্বিশ পরগনা ও উত্তর-পশ্চিম ময়মনসিংহ। এই জেলাগুলো ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের ফলে এই জেলাগুলোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। যারা জীবিত ছিল তাদের অনেকেই জীবনধারণের জন্য বাড়ী-ঘর ছেড়ে ভ্রাম্যমাণ জীবন অবলম্বন করে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। এই দস্যরা বহু সুসংঘটিত দলে বিভক্ত ছিল। ফকীর-সন্ন্যাসীরা ছিল তাদের সেরা।

সমকালীন নথিপত্রে দেখা যায় যে ফকীর সন্ন্যাসী উপদ্রুত অঞ্চলের জমিদার ও প্রজারা অনবরত সরকারের কাছে আরজি জানাচ্ছে যে তারা খাজনা দিতে অপরাগ। কেননা ফকীর সন্ন্যাসীরা সব ফসলাদি এমন কি গরু-বাছুর পর্যন্ত লুট করে নিয়েছে। বীরভূমের জমিদার মহারাজা জমান খান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এক আরজিতে ফকীর সন্ন্যাসীদের কার্যাবলীর এক বিশদ বিবরণ দেন। তিনি জানান যে ফকীর-সন্ন্যাসীরা দলেবলে দুর্গম অঞ্চলে বাস করে। সারা বৎসর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গান-বাজনা করে, খেলাধুলাও করে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কৃষকরা যখন তাদের প্রধান ফসল ঘরে আনে তখন ফকীর-সন্ন্যাসীরা এসে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয় এবং চলে যাওয়ার সময় কৃষকদের বাড়ী-ঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। আবার পর বৎসর এমনি দিনে পতঙ্গের মত তাদের আবির্ভাব হয়। জমান খান জানান যে, ফকীর সন্ন্যাসীদের সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে জমিদারদের পক্ষে সরকারকে খাজনা দেওয়া অসম্ভব।

ফকীর সন্ন্যাসীদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল সরকারী ট্রেজারী, ব্যাংক, বাণিজ্য-কুটির প্রভৃতি লুট করা। এমতাবস্থায় অনেক সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হতো ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে। সংখ্যাধিক্যের দরুন অনেক সময় ফকীর সন্ন্যাসীরা ইংরেজ বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। এইসব সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দমঠ'

ও 'দেবী চৌধুরাণী'। ইলবার্ট বিলের এজিটেশনের যুগে এই ধরনের সংঘর্ষকে ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম বলে মনে করা খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক হলো এখনও ফকীর সন্ন্যাসীদের আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বলে ধরে নেয়া।

ফকীর সন্ন্যাসীদের উপর কোন জোর গবেষণা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। হয়ত এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়নি। যামিনী মোহনের 'দি সন্ন্যাসী এ্যান্ড ফকীর রেইডার্স অব বেঙ্গল'-ই একমাত্র বই যা কিছুটা নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ যুগের লেখা এই বইখানিতে একথা লেখক জোর দিয়ে বলতে পারেননি যে, ফকীর সন্ন্যাসীরা ছিল নেহায়েতই সুসংগঠিত দস্যুদল খুব স্বাভাবিক কেননা এ ধরনের জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কর্তৃক ব্যাংকে, ট্রেজারী ইংরেজ সমর্থক দেশীয় বড়লোকের বাড়ী লুট করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের কার্যাবলী ও ফকীর সন্ন্যাসীদের দস্যুতা একমানে বিচার করা যায় না। ফকীর সন্ন্যাসীরা ছিল যুগান্তর যুগের স্বাভাবিক সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী, অপরপক্ষে, সন্ত্রাসবাদীরা ছিলেন ইংরেজবিরোধী নিহিলিষ্ট ফ্যাশনের বিপ্লবী রাজনৈতিক সংঘ। যাদের লক্ষ্য ছিল বলপূর্বক ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। (দৈনিক বাংলা, ১৭ই নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭২ খৃ.)

ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে

মেসবাহুল হক

দৈনিক বাংলায় "বাংলাদেশ ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য" বিভাগে প্রকাশিত জনাব মুহাম্মদ আবূ তালিবের লেখা প্রবন্ধ "ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে" পড়লাম। এরপর গত ১৭ই নভেম্বর তারিখের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেখা প্রতিবাদ নিবন্ধটিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবূ তালিব সাহেব একজন গবেষক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ফকীর ও সন্ন্যাসী আন্দোলন বিষয়টি নিয়ে বহুদিন যাবৎ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। বাংলা একাডেমী ও অন্যান্য প্রকাশনী থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী বইও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ডক্টর সিরাজুল ইসলাম তাঁর নামটিও জানেন না, আশ্চর্যের কথা। ডক্টর ইসলাম সাহেবও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। উক্ত বিষয়ে তাঁর জানাশোনা কতখানি তা আমার জানা নেই। যাহোক লেখকবৃন্দের উভয়েই সুপণ্ডিত এবং গবেষক। আমি এর কোনটাই নই। পণ্ডিত বা গবেষক হওয়ার সৌভাগ্যও হয়নি আমার। তবে অনেক ইতিহাস পড়েছি। পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণাপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাই ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সাহেবের লেখা প্রতিবাদ নিবন্ধটি পড়ে আমি সচকিত হলাম এবং উল্লিখিত বিষয়ে কিছু বক্তব্য পেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করলাম।

আবূ তালিব সাহেব ফকীর সন্ন্যাসীদের আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন, এবং ডক্টর সিরাজুল ইসলাম তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। উক্ত প্রসঙ্গে আমি একটি ঐতিহাসিক সত্যকে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরতে চাই।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর এদেশের সর্বময় শাসনভার চলে গেল ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর হাতে। বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্পদকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে তারা শাসনের নামে শোষণ আর পীড়নে ত্রাসের সৃষ্টি করে চললো দেশের সর্বত্র। ইংরেজ কোম্পানীর নিষ্ঠুর শোষণ আর তাদের অনুগ্রহে পালিত জমিদার মহাজনদের অত্যাচারে সমগ্র দেশ জুড়ে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার চাপে পড়ে এদেশের সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়লো। শোষণের নিষ্পেষণে অতিষ্ট হয়ে উঠল এদেশের কৃষক, কামার আর তাঁতীরা। চিরকালের নিরীহ মানুষ মুখ বুজে মার খাওয়ার অভ্যাস বর্জন করে হয়ে উঠল প্রতিবাদমুখর। হাতে তুলে নিল সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। গ্রহণ করলো শত্রুকে ক্ষমা না করার কঠোর প্রতিজ্ঞা।

ইংরেজ শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ সালে। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ বিদ্রোহ স্থায়ী ছিল। ইতিহাসে এ বিদ্রোহ 'সন্ন্যাসী বিদ্যোহ' বা 'ফকীর আন্দোলন' নামে খ্যাত। কিন্তু মূলতঃ এটা ছিল বাংলাদেশের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। তবুও এ ঐতিহাসিক বিদ্রোহ ইতিহাসে "সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ" নামে কেন পরিচিত হল, সর্বপ্রথম সে কারণগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন।

তৎকালীন চিঠিপত্র ও দু-চারখানা গ্রন্থে একে ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর "সন্ন্যাসী এন্ড ফকীর রেইডার্স ইন বেঙ্গল" গ্রন্থে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের বক্তব্য ও স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সুরে সুর মিলিয়েছেন মাত্র। ওরায়েন হেস্টিংস-এর মতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে বিভিন্ন সময়ে আগত কিছুসংখ্যক অসৎলোক সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে দল বেঁধে ঘোরাফেরা করত, আবার অনেকে কিছু জমিজমা ক্রয়ের মাধ্যমে কিংবা দানসূত্রে জমির মালিক হয়ে কৃষিকার্জ করে জীবন-যাপন করতে থাকে। কৃষক হলেও এদের পোষাক পরিচ্ছদ ছিল ফকীর সন্ন্যাসীদের পোষাকের অনুরূপ। মুসলমান ফকীর বা হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ওদের সবাইকে নেহায়েৎ হানাদার বা লুণ্ঠনকারী বলে অভিহিত করলে ওদের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ ওদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক সত্যিকার যোগী তাপস ছিল। যাদের সত্যিকার ধার্মিক এবং বিদ্বানরূপে সম্মান করা চলতো। বলা বাহুল্য, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সাহেবও উক্ত বক্তব্যের সাথে সুর মিলিয়েছেন মাত্র।

একথা সত্য যে ওরা 'গিরি' 'মাদারী' প্রভৃতি নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় (উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ) স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। এসব ফকীর সন্ন্যাসীরা কালক্রমে কৃষকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কৃষক হলেও এরা ফকীর সন্ন্যাসীদের পোষাকই পরিধান করতো। এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বছরের বিভিন্ন সময়ে দল বেঁধে তীর্থ ভ্রমণে বের হতো।

মোগল আমলের মধ্যভাগ হতেই বাংলাদেশ ও বিহারের বহু অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু সন্ন্যাসী ও ফকীর স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কালক্রমে তারা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়। উত্তরবঙ্গে এদের বহু দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় এরা প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গেই ভিড় করে বেশী। ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক হিসেবে এরা ইংরেজ শাসকদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসকদের আগে বাংলাদেশের কোন শাসকই ফকীর-সন্ন্যাসীদের তীর্থ-ভ্রমণে বাধা দেয়নি। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ ফকীর-সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধভাবে তীর্থ-ভ্রমণের মধ্যেও শোষণের একটা পথ খুঁজে বের করে। তীর্থযাত্রীদের মাথাপিছু কর ধার্য করে বিপুল পরিমাণে অর্থ লুট করতে থাকে। এরা একদিকে কৃষক অন্যদিকে সন্ন্যাসী ফকীর। অথচ উভয় দিক

দিয়েই ওরা শোষণের শিকারে পরিণত হ'ল। ফলে ধীরে ধীরে ওদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে এবং বিদ্রোহ ছাড়া অত্যাচারী শাসকদের কবল থেকে জীবিকা ও ধর্ম রক্ষা করার অন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না। অতএব এ-কথা সুস্পষ্ট যে, স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেল ওরায়েন হেস্টিংস এই মহান বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত করলেও তা মূলতঃ ছিল বাংলাদেশের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৭-২৭)। কার্ল মার্কসের "ফিউচার রেজাল্টস অব বৃটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া"তেও এ বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের কৃষক বিদ্রোহ, বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে কৃষক কারিগরদের জীবন রক্ষার সংগ্রাম। বিদ্রোহী বাহিনী ও বিদ্রোহের নায়কেরা যখন যেসব অঞ্চলে গিয়েছিল সে সব অঞ্চলের জমিহারা গৃহহারা কৃষকগণ তাদের সবরকম সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল এবং ফলে বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দিয়ে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল (দৃষ্টব্য ঃ লেটার ফ্রম দি সুপার ভাইজার অব পুর্ণিয়া টু দি কাউন্সিল অব রেভিনিউ অ্যাট মুর্শিদাবাদ, ডেটেড ২৫ জুন, ১৭৭০)। ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ দুর্ভিক্ষের পরবর্তী কয়েক বছরে বহু সহায়-সম্বলহীন নিরন্ন চাষী যোগ দেয়ায় তাদের (ফকীর সন্ন্যাসীদের) সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এই সকল কৃষকদের না ছিল বীজধান, না ছিল চাষাবাদের সাজ-সরঞ্জাম। ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয় (পল্লী বাংলার ইতিহাস—হান্টার। পৃঃ ৬২)। কৃষক ছাড়া আর যারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তারা হ'ল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈনিকগণ। মোটকথা, এরাই হল তথাকথিত গৃহত্যাগী (গৃহহারা) ও সর্বত্যাগী (সর্বহারা) সন্ন্যাসী-ফকীর। এক সময় এরা সংখ্যায় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া ইংরেজ বণিকেরা যখন দেশীয় কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্র বিলেতে চালান দিতে লাগল তখন নিরুপায় হয়ে কারিগরগণ ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ১৭৫৮ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত এ ক'বছরে কৃষকদের সাথে সাথে কারিগরদেরও একটা বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ল। এ সময়ে ঢাকার মসলীন বস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ ও পীড়নে অস্থির হয়ে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে। পরে সুযোগমত ফকীর সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে (ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। পৃঃ ২৪)

এর পরও কি ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সাহেব বলবেন যে ফকীর সন্ন্যাসীদের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না, তারা শুধুমাত্র দস্যুবৃত্তি করেই বেড়াতো ?

এ কথা সত্য যে প্রথমদিকে পেটের দায়ে তারা কিছু লুটতরাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো তারা ? হান্টার সাহেবের ভাষায় ঃ 'প্রদেশে আরও ৯ মাস চলার মত খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। .... ফসল কাটার সময় খাদ্যশস্য কিনে নিয়ে মজুদ করে রাখা হত। অনটনের সময় তা চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণে মুনাফা করা হতো। ফলে দ্রুত দাম বেড়ে যেতো।'

এ সব শস্য মজুদ করে রাখত কারা ? কোম্পানীর দালাল ব্যবসায়ী ও জমিদার মহাজন শ্রেণীর লোকেরা। এমন কি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরও কিন্তু দেশের শাসনকর্তাদের টনক নড়েনি। তৎকালীন কোম্পানী সরকারের কোর্ট অব ডিরেক্টরকে লিখিত কাউন্সিলের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, "অবস্থা শোচনীয় হলেও কাউন্সিল তখনও রাজস্ব বা নির্ধারিত পরিমাণ খাজনা আদায় কম হয়েছে বলে মনে করেন না।" (পল্লী বাংলার ইতিহাস, হান্টার, পৃঃ ১৬, ১৯, ৪৯)।

তাই ফকীর সন্ন্যাসীদের বাধ্য হয়েই এসব কসাই শ্রেণীর মজুদদার ব্যবসায়ী ও জমিদার মহাজনদের সম্পত্তি লুট করেছিল। হানা দিয়েছিল অবিবেচক অত্যাচারী শাসকদের ট্রেজারী ও বাণিজ্য কুঠিতে।

জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব তাঁর লেখায় একটি যুক্তিহীন কথা বলেছেন যে, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কৃষকেরা যখন তাদের ফসল ঘরে আনে তখন ফকীর সন্ন্যাসীরা এসে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয় এবং চলে যাওয়ার সময় কৃষকদের ঘরবাড়ী পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। সিরাজুল ইসলাম সাহেব হয়ত এ তথ্য পেয়েছেন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের লিখিত বিবরণ অথবা রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষের মত ইংরেজ দালাল ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর লোকদের লিখিত কোন কোন গ্রন্থ থেকে। তিনি বিদ্রোহের মূল কারণ কি বা বিদ্রোহের নায়ক কারা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন নি। আমার উপরোক্ত বিবরণ পড়ে তিনি নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবেন যে, ইংরেজ শাসকগণ যে মহান বিদ্রোহকে "সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করেছিলেন, মূলতঃ তা ছিল এ দেশের কৃষক, তাঁতি ও কারিগরদের বিদ্রোহ। শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহ। কাজেই অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষের কাছে এ বিদ্রোহ চিরদিন আদর্শ হয়ে থাকবে। ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সাহেবের মত একজন বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির বোঝা উচিত ছিল যে বৃটিশ সরকারের বিবরণে বিদ্রোহীদের লুটেরা দুষ্কৃতিকারী রূপে চিত্রিত করাই ছিল স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিবরণকে তিনি কিভাবে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করলেন?

জনাব আবু তালিব সাহেব যদি ফকীর সন্ন্যাসীদের আন্দোলনকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ও প্রথম আলোর দিশারী বলে বর্ণনা করে থাকেন তবে তাতে অবাক হবার কি আছে ? বৃটিশ বেনিয়া কোম্পানীর হাতে এ দেশের শাসনভার যাওয়ার মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই এ-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, এবং স্বৈরাচারী শাসন ও অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে এটাই ছিল এ দেশের নির্যাতিত মানুষের প্রথম সংগ্রাম। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ বিদ্রোহের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয় বলে আমার ধারণা।

দৈনিক বাংলা, ঢাকা।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯
১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২

প্রমাণপঞ্জী

গ্রন্থ-তালিকা ঃ বাংলা

আবু তালিব, মুহম্মদ। বিস্তৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়। পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৮।

" হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (র)-এর জীবনেতিহাস। পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৮।

" বাংলা সাহিত্যের ধারা, উত্তর বঙ্গ লাইব্রেরী, ঘোড়ামারা, রাজশাহী, ১৯৬৮।

আমানত উল্লাহ্ আহমদ খান চৌধুরী। কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। কোচবিহার স্টেট, ১৯৩৬।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। বংশ পরিচয়। কলিকাতা, ১৩২৮-১৩৩০ (১৯২১-২৩)১ম-৩য় খণ্ড।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। বঙ্গীয় বিশ্বকোষ।

নিখিলনাথ রায়। মুর্শিদাবাদ কাহিনী (কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯০৯)।

প্রভাসচন্দ্র সেন। বগুড়ার ইতিহাস। ২য় সং। বগুড়া, ১৩৩৬ (১৯২৯)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ২য় সং। কলিকাতা, ১৩৫৪-১৯৪৭।

ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায়। কোচবিহারের ইতিহাস, ২য় সং। কোচবিহার, ১৮৮৪।

ইংরেজী ঃ

Allen, B. C. Eastern Bengal District Gazetteer, Dhaka, Allahbad, 1912.

Hunter, W. W. Statistical Account of Bengal.

" " Vol. Vll. London, 1876.

" " Annals of Rural Bengal, 3rd. Ed. London, 1868.

Huq. Dr. Mazharul, The East India Company's Lan Policy, Dhaka, 1964.

Jadu Nath Sirker, Sir, Ed. History of Bengal, Vol. ii. Dacca, 1948.

Jamini Mohan Ghose, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Culcutta, 1930.

Marshall, P. J. The Impeachment of warren Hastings. Oxford, 1965.

Omally, L. S. S. Bengal District Gazetteer, Rajshahi,

Sayed Ahmad, Sir, Review on Dr, Hunter's Indian Musalman, Beneres, 1872.

Sachse, F. A. " Mymensing, Calcutta, 1917.

Scott, J. M. A. Reply so Mr. Burke's Speech. London on the first of December, 1783

Vas, J, A, M, A, Rangpur, Allahabad, 1911.

ঘটনা ও কালপঞ্জী

হযরত হাসান মুরিয়া বুরহানাকে প্রদত্ত সুলতান শাহ্ গুজার সনদ	১৬৫৯
টেপাঝাকৈরের (বগুড়া) জমিদারদের বাসভূমি ত্যাগ	১৭৫০
পলাশী	১৭৫৭
উধুয়ানালা	১৭৬১
বকসার	১৭৬৪
বাখরগঞ্জে ফকীর (ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রতিনিধি মিঃ কেলীকে আক্রমণ)	১৭৬৩
রামপুর বোয়ালিয়ার (রাজশাহী) কুঠি আক্রমণ	১৭৬৩
ঢাকার ফ্যাক্টরী আক্রমণ	১৭৬৩
মীর যাফর আলী খানের মৃত্যু	১৭৬৫
ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ	১২ই আগষ্ট, ১৭৬৫
কোচবিহারে গণ্ডগোল ঃ শিশু রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ হত্যা	১৭৬৫
ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন প্রাপ্তি	১৭৬৯
রাজভ্রাতা রামনারায়ণ (দেওয়ান) হত্যা	১৭৬৯
ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলায় আগমন	১৭৭৪
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	(১৭৬৯-৭০, ১১৭৬বাং)
নাটোরের রাণী ভবানীর নিকট মজনু শাহের চিঠি	১৭৭২
ক্যাপ্টেন টমাসের সন্তোষগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ ৩০শে জানুয়ারী,	১৭৭২
ক্যাপ্টেন টমাসের হত্যা	২০শে ডিসেম্বর, ১৭৭২
ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসের যুদ্ধ ও মৃত্যু	১লা মার্চ, ১৭৭৩
কোচবিহারের অন্তর্বিপ্লব ও কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি	১৬ই জানুয়ারি, ১৭৭৩
ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু	১৭৮৩ (১১৯০ সাল)
রাজাধরা	১৭৮৭ (১১৯৪) "
গ্লাডউইন সাহেবের বগুড়া আগমন ও মজনু শাহের সঙ্গে সংঘর্ষ	১৫ই মার্চ, ১৭৭৬
নবাব মীর কাসিমের ওফাত	৭ই জুন, ১৭৭৭
দেবীসিংহের বিরুদ্ধে প্রজা অভ্যুত্থান	১৭৮৩
নবাব নূরউদ্দীনের সঙ্গে কোম্পানী বাহিনীর মুঘলহাট ও পাটগ্রাম যুদ্ধ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি,	১৭৮৩
নবাব নূরউদ্দীনের ওফাত-	১৭৮৩
ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার ও এডমন্ড বার্কের স্মরণীয় বক্তৃতা	১লা ডিসেম্বর, ১৭৮৩
ভবানী পাঠকের মৃত্যু	আগস্ট, ১৭৮৭
মজনু শাহের ওফাত	মার্চ অথবা মে, ১৭৮৭
মুসা-ডাউসন সংঘর্ষ	আগস্ট, ১৭৮৭
প্রজাবিদ্রোহের রায়	১৭৮৯

রাণী-ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ	১৭৮৮
লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনভার গ্রহণ	১৭৮৯
হর রামের মৃত্যু	১৭৯০
কড়াইবাড়ী ও শেরপুরের জমিদারদের সীমান্ত-বিরোধ	১৭৯১
কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১৭৯৩
চেরাগ আলী শাহের ওফাত	আগস্ট, ১৭৯৪
যহুর শাহের (Jory Saw) জেল	১৭৯৪
সোবহান শাহ ও করীম শাহের সঙ্গে নেপালী সুবার গোপন পত্রালাপ	অক্টোবর, ১৭৯৪
স্যার জন শোরের মধ্যস্থতা ও ফকীর আন্দোলনের সমাপ্তি	১৭৯৫

ইফাবা—২০০৩-২০০৪ প্র/৫৬৯৪(উ)—৭,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত
কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	পৃষ্ঠা	মূল্য
মুসলিম মনীষা	লেখকমণ্ডলী (সংকলন)	৩৮৪	৭০.০০
ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)	এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম	৫৬৮	২০৪.০০
আল্লামা জারীর তাবারী (র)	ড. মোঃ আজিজুল হক	২৯২	৬০.০০
হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)	এ.এম.এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দীক আহমদ খান	৩২৪	৭০.০০
সহাবা চরিত (১ম খণ্ড)	সৈয়দ সুলায়মান নদভী	৩০৮	৬৪.০০
সহাবা চরিত (৫ম খণ্ড)	সৈয়দ সুলায়মান নদভী	২৪৪	২৫.০০
সহাবা চরিত (৮ম খণ্ড)	সৈয়দ সুলায়মান নদভী	২১৩	১৯.০০
হযরত ইবরাহীম (আ) ঃ জীবন ও সময়কাল	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	২৩০	৪৩.০০
হযরত উসমান গনী (রা)	গরীবুল্লাহ্ মাসরুর	৮৮	২৮.০০
বিপ্লবী উমর	অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত	৮০	১৯.০০
রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা	ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্	৩২৮	৮৭.০০
সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) (১ম খণ্ড)	সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী	৪৭২	৯০.০০
সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) (২য় খণ্ড)	সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী	৪৬২	১৫০.০০
হযরত আবূ হুরায়রা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	২৯	১৩.০০
শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)	ড. মুশতাক আহমদ	৫১২	১১০.০০
যায়েদ ইবনে হারিসা	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	১০২	৩০.০০
মদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)	ড. মুহাম্মদ মজিবুর রহমান	২২৬	৩৬.০০
মহসত্যের সন্ধানে হযরত সালমান ফারসী (রা)	শাহজাহান ইবনে হায়দার	২৫৬	৪০.০০
বাংলাদেশের সূফী-সাধক	ড. গোলাম সাকলায়েন	৩৪৮	৮৬.০০
হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)	এ.এফ.এম. আবদুল মজিদ রুশদী	২৮৮	৬২.০০
ইমাম মুসলিম (র)	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	৩৬	১৪.০০
ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্	৩৫২	৭২.০০

ফকীর নেতা মজনু শাহ্

মুহম্মদ আবূ তালিব



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ